মহাকালের বন্দর

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

প্রকাশ করেছেন শ্রীময়ূখ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে ● ছেপেছেন শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন, দীপ্তি প্রিণ্টার্স, ৮৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলিকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীপ্রণবেশ মাইতি

অধ্যাপক শিশির কুমার দাস

বন্ধুবরেষু

॥ এক ॥

চেয়ার ছেড়ে উঠল এ্যাডাম। ঘন কুয়াশা ভোরের দিকে পাতলা হয়ে আসছে। নদীর মোহনায় বসে ধুনুরী রাশ রাশ তুলো ধুনে চলেছে, আর সেই তুলোর রেঁায়াগুলো যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে জালপাই-এর দিকে।

লাইটহাউসের ওপরের ঘরে জানালার গরাদ ধরে সারা রাত সমুদ্রের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে এ্যাডাম। অমাবস্যার জোয়ার লাইটহাউসের নিচের মাটি ভিজিয়ে দিয়ে গেছে।

এ্যাডাম মাঝে মাঝে ওপরে গিয়ে আলোটা ঠিক মত জ্বালানো হচ্ছে কিনা তার তদারকী করে এসেছে। কিন্তু আলো যত উজ্জ্বলই করা হোক না কেন ঘন কুয়াশা ভেদ করে তা সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

বেশ খানিক দূরে একটা জাহাজের বাঁশি বেজে উঠল। পাঁচতলা লাইটহাউসের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে 'তুনিরা, তুনিরা' বলতে বলতে নিচে নেমে এলো এ্যাডাম। চৌকিদারকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলল, চল চল জাহাজ এসে গেছে।

চৌকিদার. সাহেবের কথা শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে হাতে একখানা মোটা লাঠি বাগিয়ে ধরে ছুটে চলল তার পিছন পিছন। ওরা এখন বাহার-ভেড়া (সী-ডাইক) ঘুরে যাবে না। ফসল কাটা মাঠের ওপর দিয়েই সিধে চলে যাবে খাজুরী বন্দরে। কাউখালির বাতিঘর থেকে পাঁচ মাইল বন্দরের পথকে ওরা সাড়ে তিন মাইল কমিয়ে আনবে।

মাঠের পথ এখন চলার পক্ষে বড় একটা সুবিধের নয়। ধান কাটা হয়ে যাবার পর সারা মাঠ জুড়ে বসে আছে ধানগাছের শুকনো গোড়াগুলো।

চৌকিদার গ্রাম্য লোক। এ সব অঞ্চলের মানচিত্র তার মুখস্ত। সাহেবকে বারবার পড়তে দেখে সে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, সাবধান সাহেব, নাড়া বুদা।

এ্যাডাম ধানগাছের কেটে নেওয়া অংশে বুটের ঠোকর মেরে বলল, ড্যাম ইয়োর নাড়া বুডা। বলার সঙ্গে সঙ্গেই শিশির-ভেজা পিচ্ছিল মাটির ওপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এ্যাডাম।

চৌকিদার টেনে তুলতে যেতেই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল। বলল, জোরে জোরে চল। জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে অ্যানি

আমাকে দেখতে না পেলেই আপসেট হয়ে পড়বে।

কুয়াশার জন্য সারা রাত কি উদ্বেগেই না কাটিয়েছে এ্যাডাম। কাউ-খালির বাতিঘরের চার্জ নিয়ে সে খাজুরী অঞ্চলে এসেছে আজ তিন বছর। তার আসার আগে সাত বছর যিনি এই লাইটহাউসের চার্জে ছিলেন সেই উইলিয়াম রীড নামের মধ্যবয়সী মানুষটি তাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন, ইয়ং ম্যান, জায়গাটা নির্জন, খুবই নির্জন, কিন্তু নিঃসঙ্গ মনে হবে না কোন দিন।

কথাটা এ তিন বছরে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে এ্যাডাম। প্রথম প্রথম মিডলসেক্সের স্মৃতি তাকে বড় পীড়িত করত। রেভারেণ্ড টমাস ব্রাকেনের এক ছেলে এক মেয়ে। এ্যাডামের যখন তের বছর বয়েস আর অ্যানির আট তখন টমাস ব্রাকেন বিপত্নীক হন। শহরতলীর এক চার্চে কাজ করতেন টমাস ব্রাকেন। সৎ নিষ্ঠাবান ক্লার্জিম্যান। ভোরবেলা ছেলেমেয়ের হাত ধরে যখন বের হতেন প্রাতঃভ্রমণে তখন আশপাশের কৃষক, শ্রমিক, পশুপালকেরা তাঁর মুখোমুখি হলেই উপদেশ, পরামর্শ আর আশীর্বাদ চাইত। রেভারেণ্ড ব্রাকেন মানুষের হৃদয়ের ভেতর পৌঁছে তাকে আশ্বস্ত করত।

ভোরবেলা উঠে রেভারেণ্ড ব্রাকেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে প্রার্থনায় বসতেন। শিশুকাল থেকে প্রতি দিন ঐ প্রার্থনার অভ্যেসটি থেকে গেছে ভাইবোনের। প্রার্থনার শেষে রেভারেণ্ড কোন দিন বলতেন, জল যেমন পাত্রের গায়ের ময়লা পরিষ্কার করে তেমনি প্রার্থনা মনের ওপর জমে ওঠা ময়লা পরিষ্কার করে।

আবার কোন দিন বলতেন, মনের স্বাস্থ্য যদি ভাল রাখতে চাও তাহলে প্রতি দিন নতুন চোখ আর মন নিয়ে প্রকৃতিকে দেখার চেষ্টা কর। প্রকৃতির মত শিক্ষক নেই। সে তোমাকে প্রতি দিন নতুন পাঠ দেবে।

শুধু ভাল ভাল কথাই বলতেন না রেভারেণ্ড ব্রাকেন, ভোরবেলা ক্ষেত-খামার আর বনের ভেতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ছেলেমেয়েকে প্রতিটি ফুল, লতা-পাতা, গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। প্রতিটি ঋতু শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের নিয়ে যেতেন। ঋতুর ছোঁয়ায় গাছেদের কি পরিবর্তন ঘটছে তা পরিষ্কার দেখিয়ে তিনি ছেলেমেয়েকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন।

কৃষকরা ক্ষেতে কাজ করছে দেখলেই ছেলেমেয়েকে বলতেন, এদের

কোন দিন অবজ্ঞা কোরো না। এরা তোমাদের জীবনধারণের জন্য সব-কিছু দরকারী জিনিসই যোগান দেয়। শুধু তাই নয়, বিধাতার পরে এরাই সবচেয়ে বড স্রষ্টা।

বাবা মারা গেলেন হৃদরোগে। চার্চে প্রার্থনারত অবস্থায়। এ্যাডামের কুড়ি বছর ছুঁতে তখন দু-মাস বাকী। আর অ্যানি তখন পঞ্চদশী। বাবার প্রতিবেশী বন্ধু আঙ্কল সেসিল কনভেন্টে পডাশোনার ব্যবস্থা করে দিলেন অ্যানির। আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক পরিচিত ব্যক্তিকে ধরে এ্যাডামের জন্য পোর্টের একটা চাকরি জোগাড করে পাঠিয়ে দিলেন ইণ্ডি-য়াতে।

নির্জন সমুদ্রতীরের এই বাতিঘরটি কিন্তু এ্যাডামের কাছে এখন আর নিঃসঙ্গতার গুরুভার বলে মনে হয় না। এ্যাডামকে বাদ দিয়ে পাঁচটি লোক থাকে এখানে। চৌকিদার ভুবন ভক্তা, ঝাড়ুদার কুমর শামল, আলো জ্বালা-বার দুটি লোক আমানত আর ইয়ার আলি। এ ছাড়া সাহেবের খিদমতগার অর্জুন বাগ।

ভুবন ভক্তা ছাডা বাকী চারজন পেটুয়া গাঙের ওপারে দরিয়াপুর অঞ্চলের লোক। ভুবন ভক্তার আদি নিবাস খাজুরী বন্দরের কয়েক মাইল দূরে বৈষ্ণবচক গ্রামে। এই গ্রামটি এককালে ছিল বৈষ্ণব প্রধান। ভুবন ভক্তার বাপ পিতামহ সবাই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিল। গৃহস্থ বৈষ্ণবরা এ অঞ্চলে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সৎকুলী আর অনন্তকুলী। এদের রীতি-নীতি আচার-আচরণে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সৎকুলীরা স্বজাতীয়া মেয়েদের সঙ্গেই কেবল কণ্ঠি বদল করে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্গোপ, করণ, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় যারাই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হোক না কেন, বিয়ের সময় স্বজাতীয়া মেয়েকেই কেবল তারা গ্রহণ করে। মহোৎসবের সময় বিভিন্ন জাতীয় সৎ-কুলীরা স্ব স্ব জাতিকে নিয়ে পৃথক পৃথক পঙক্তিতে বসেই প্রসাদ পায়। অন্য দিকে অনন্তকুলী বৈষ্ণবদের ও-সব বাদ-বিচার নেই। বিয়ে থেকে ভোজন সব জাত একাকার।

ভুবন ভক্তা সৎকুলী বৈষ্ণব হয়েও যৌবনে এক কাণ্ড করে বসেছিল। গান পাগল ভুবন কীর্তনানন্দে মত্ত হয়ে এক সময় পথে প্রান্তরে খোল কর-তাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। লোকে তাকে ঘরে ডেকে ডেকে কীর্তন শুনত। এমনি একদিন পথ চলতে চলতে সে তাম্রলিপ্তের অন্তর্গত বীরপুর গ্রামে এসে পড়ে। সেখানে ক'ঘর ফিরিঙ্গী খ্রীষ্টানের বাস। কার্য উপলক্ষে একদল

পর্তুগীজ এক সময় ঐ অঞ্চলে আসে। তারা আর দেশে ফিরে যায়নি। দেশীয় মেয়েদের বিয়ে সাদি করে সংসার পেতে থেকে যায়। তাদের সন্তান সন্ততিদের লোকে বলত ফিরিঙ্গী।

মীরপুরের সেই ফিরিঙ্গী পাড়ায় এসে আটকে গেল ভুবন ভক্তা। ভুবনের গান শুনে ফিরিঙ্গীরা তাকে আর ছাড়তেই চায় না। প্রতি দিন ভাল রকমের ভোজ দিয়ে তাকে আটকে রাখল তারা। এদিকে ভুবনের চোখ পড়েছে ফিরিঙ্গী এক মেয়ের ওপর। নজর কেড়ে নেবার মত রূপ। মেয়েটিও ভুবনের তরুণ গলার গান শুনে মুগ্ধ।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কথা ভুবন তার দরদভরা গলায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলত। তারপর কীর্তন। আখর দিয়ে কীর্তন। আসর একদম মাৎ। তরুণী মেয়েটি তখন তার চোখে হয়ে যেত রাধারাণী।

শেষে একদিন ফল মিলল। রাতের অন্ধকারে ফিরিঙ্গী মেয়েটিকে নিয়ে অকূল দরিয়ায় ভাসল ভুবন। এক সময় অনেক গাঁ-গঞ্জ ঘুরে ভুবন ফিরে এলো আপন ঘরে। সব শুনে বৈষ্ণব মহাজনেরা বিচারে তাকে এক ঘরে করল। তাতেও যখন টলল না ভুবন, তখন শুরু হল হাটে মাঠে ঘাটে তার ফিরিঙ্গী বউটাকে নিয়ে টানাটানি। শেষে সমাজের সঙ্গে যুঝতে না পেরে ভুবন অন্তঃসত্ত্বা বউ নিয়ে চলে এলো কাউখালি বাতিঘর থেকে কিছু দূরে নির্জন জালপাই-এর জঙ্গলে। নিজের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে সে তুলল একটা ছোটখাট কুঁড়ে। তারপর কাজ খুঁজতে খুঁজতে এলো খাজুরী বন্দরে। এখানে গান শুনিয়ে দুটো পেট চালানো ভীষণ দায়। শুরু হল কায়িক পরিশ্রম। সিকেয় উঠল গান। জাহাজ থেকে মাল বাজারে বয়ে আনত ভুবন ভক্তা। সারাদিন পরিশ্রমের পর যা পেত তাই নিয়ে আসত তিন চার মাইল হেঁটে জালপাই সীমানায় তার বসত বাড়িতে।

প্রথম মেয়ের জন্ম দিতে গিয়েই মরল ভুবনের বউ। কিন্তু বেঁচে গেল সন্তানটি। সব হারানোর মাঝে ভুবনের সান্ত্বনার ঐ একটি মাত্র আশ্রয়। তাকে ফেলে কাজে বের হওয়া অসম্ভব। আবার কিছু রোজগার না হলেও যে দিন চলে না। তাই শিশু কোলে নিয়েই শুরু হল আবার গান ও ভিক্ষে।

ছোটবেলা থেকেই সাগর বাবার গলায় গান শুনে গানের বড় ভক্ত হয়ে উঠেছিল। সে খুব শৈশব থেকেই বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইত। ভুবনের সঙ্গে বালিকা সাগর যখন গান গাইত তখন চারদিকে ভীড়

জমে যেত। তার বাঁশির মত মিষ্টি গলা শ্রোতার কানের ভেতর দিয়ে একেবারে প্রাণ ছুঁয়ে দিত।

সাগর যখন চোদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পড়ল তখন তার ফিরিঙ্গী রক্তের বাড়বাড়ন্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে পথচারীর আর চোখ ফিরত না। সাগর তো মেয়ে নয়, যেন কারিগরের তৈরি প্রতিমা। কে বলবে ভুবন ভক্তার মত অতি সাদামাঠা চেহারার একটি মানুষ তার বাপ।

বয়েস হয়েছে, অমনি ফেউ লেগে গেল মেয়ের পিছনে। কোথাও শান্তি নেই। বাইরে কোথাও গান করতে গেলে পিছু লাগে দুষ্ট লোক। ঘরে ফিরে এলেও ধাওয়া করে ঘর অব্দি। রাত-বিরেতে যখন নির্জন জালপাই জঙ্গলে মানুষের আসা-যাওয়া, কানাকানি শুনল ভুবন তখন আর ঐ জায়গায় সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে একা একা থাকা নিরাপদ মনে করল না। সে একদিন ভোররাতে মেয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালাল।

প্রথমে এলো সে নিজের গাঁ বৈষ্ণবচকে। যদি বৈষ্ণবকুলে বিয়ে দিয়ে মেয়ের একটা হিল্লে করতে পারে। কিন্তু সমাজপতিরা তখনও অনড়। ভুবনের মেয়েকে পার করার প্রশ্নই ওঠে না। শেষে বা যদিও অনন্তকুলী সম্প্রদায়ের দু-চারজন এগিয়ে এলো, তাদের দেখে ভুবনের কিন্তু প্রাণ চাইল না। সব কটাই প্রায় গলিত নখদন্ত। কেবল লালসার আগুন জ্বলছে চোখে।

সেখান থেকে পালিয়ে এলো হিজলীতে। হিজলী বন্দরের তখন আর সে রমরমা নেই। তাহলেও হিজলীর পাশে মেহেদীনগর তখনও বাজার হাটে, লোকজনের আনাগোনায় সরগরম। বাপ আর মেয়ে একটা চটিতে রাত কাটাল। সেই চটিতেই আলাপ চটির মালিক পিতাম্বর দাসের সঙ্গে। পিতাম্বরের সহৃদয়তার জালে জড়িয়ে পড়ল ভুবন আর তার মেয়ে।

পিতাম্বরের মধ্যস্থতায় সাগরের বিয়ে হয়ে গেল। জমিদার হরশঙ্কর তাঁর একটি বাগান বাড়িতে সাগরের সঙ্গে কণ্ঠি বদল করলেন। বাগান বাড়িতেই স্থান হল সাগরের। দালাল পিতাম্বর দাস ভুবনকে বুঝিয়ে বলল, এই তো ভাল হল ভায়া। পুরো একটা বাগনবাড়ির অধিকারী হল তোমার মেয়ে। জমিদারের খাসমহলে তিন সতীনের ঠেলাঠেলির ভেতর না থেকে একা এই রাজত্বে জমিদারবাবুর পেয়ারে থাকবে তোমার মেয়ে। কিন্তু ভায়া, একটি কথা মনে রেখ, জমিদারদের কায়দা-কানুনই আলাদা। মেয়েকে দেখব বলে হপ্তায় হপ্তায় বাগানবাড়িতে ছুটে এসেছ কি মরেছ। দেউড়ির সামনে দরোয়ানের ধাক্কা খেয়ে ফিরতে হবে।

কথা শুনে মুখখানা শুকিয়ে গেল ভুবনের। পিতাম্বর দাস অভিজ্ঞ দালাল। মানুষের মন বুঝতে তার একটুও দেরি হয় না। সে অমনি সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এ কত বড় সৌভাগ্য যে হরশঙ্করবাবুর মত জমিদার তোমার মত ভিখিরী বোষ্টমের মেয়েকে পছন্দ করে বিয়ে করেছেন। মেয়ের মঙ্গল হোক এই তো তুমি চাও, তাহলে না-ই বা এলে মেয়ের কাছে। আসল কথা তোমাকে শ্বশুর বলে স্বীকার করতে এত বড় জমিদারের অপমানে মাথা কাটা যাবে না? মেয়ের ভাল যদি চাও বু... কাজ কর ভায়া।

পিতাম্বরের কথা মত সেই যে ভুবন ভক্তা মেয়েকে মেহেদীনগরের জমিদারের বাগানবাড়িতে ফেলে এলো আর সে-মুখো হল না একটি বছর। মন কাঁদে তবু যেতে পারে না সে। বড মানুষের বাড়ির বড ব্যাপার। মনকে সান্ত্বনা দেয় ভুবন, সমাজ যে মেয়েকে নেয়নি, সে যে জমিদার ঘরণী হয়েছে সে কি কম ভাগ্যের কথা! মেয়ে তার সুখী হোক, আনন্দে থাকুক, রাধা-মাধবের কাছে এই তার প্রার্থনা।

ইতিমধ্যে খবর রটল, জমিদারের হাত থেকে নুনের কারবার সরকার পুরোপুরি গ্রহণ করবে। আর সেই সঙ্গে নিয়ে নেবে জালপাই-এর জঙ্গল। নুন তৈরির জন্যে চাই জঙ্গলের কাঠ।

যে জমিদারের অনুমতি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঘর তুলেছিল ভুবন ভক্তা সেই জমিদার সরকারের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে তাড়াতাড়ি জালপাই মহালটি বেচে দিল অন্য জমিদারের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন জমিদারের পাইক এসে ভেঙে দিয়ে গেল ভুবন ভক্তার ঘর।

নিরাশ্রয় ভুবন পাঁচজনকে ধরে হিজলীর সল্ট এজেন্ট ফার্গুসন সাহেবের কাছ অব্দি পৌঁছল। ফার্গুসন তার দুঃখের কথা শুনে লাইটহাউসের চৌকিদারের কাজটা যোগাড় করে দিলেন।

কাউখালি থেকে মেহেদীনগর দু' আড়াই ক্রোশ পথ। একদিন বাতি-ঘরের সাহেবের অনুমতি নিয়ে সে মেহেদীনগর গেল মেয়েকে দেখতে। কিন্তু তখন আর সাগর ছিল না জমিদার হরশঙ্করের বাগানবাড়িতে। অনেক উঁকিঝুঁকির পর দেখা হল জমিদার বাড়ির এক বুড়ো চাকরের সঙ্গে। লোকটি ভালই বলতে হবে। ভুবন ভক্তার পরিচয় জেনে সে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, মেয়েটি তোমার বড় ভাল বাপু। আমাকে বাপের মত ভক্তি করত। আমি জানতাম, জমিদারবাবু যে নুন আর কাপড়ের ব্যবসা

করেন তার সঙ্গে কোম্পানির লোকের যোগাযোগ আছে। এই বাগান-বাড়িতে জমিদারবাবু সাহেবদের খানাপিনা আর ফুর্তির ব্যবস্থা করে দেন। এক একটি মেয়েকে আনেন সাহেবদের ভোগের জন্যে। তোমার মেয়ে-টিকে দেখে বাপু আমার মন কেমন করত। তাই মাসখানেক আগে যখন জানলাম সাহেবদের জোর খানাপিনার ব্যবস্থা হবে তখন মাকে আমার সব কথা খুলে বললাম। মা আমাকে 'বাবা' বলে ডাকল আর চোখের জল ফেলে আমার সাহায্য চাইল। তখন আমি বললাম, বাঁচতে চাও তো যে-দিকে দু'চোখ যায়. পালাও। বলে আমি তার পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলাম।

ভুবন ভক্তা বলল, তুমি তার সত্যিকারের বাপ, আমি জন্ম দিয়েছি মাত্র।

ভুবন মেহেদীনগর থেকে চলে আসার সময় ভাবল, নিশ্চয়ই অভাগী মেয়েটা বাপের খোঁজে গিয়েছিল জালপাই-এর-জঙ্গলে। দেখা না পেয়ে ফিরে গেছে।

ভুবন দুঃখ পেল, কিন্তু মনে মনে শান্তি পেল এই ভেবে যে মেয়েটাকে অসহায় পেয়ে কুকুর শেয়ালগুলো ছিঁড়ে খেতে পারেনি।

মাস ছয়েক পরে মেয়ের সঙ্গে আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে গেল ভুবনের।

ভর সন্ধ্যের খাজুরীর বাজার থেকে সওদা করে লাইটহাউসে ফিরছিল ভুবন, হঠাৎ এককলি কীর্তন কানে আসতেই থমকে দাঁড়াল। জায়গাটা ভাল নয়। সাহেব-নগরের দক্ষিণে বাঁশ, চালতা আর বাদাম বনের ভেতর দশ বারো ঘর পতিতার বাস। বন্দরের লোক-লস্কর, ব্যবসায়ী, এজেন্ট, সল্ট আর পোর্ট ডিপার্টমেন্টের বাবুরা এই পল্লীতে আসা যাওয়া করেন। বহু রাত অব্দি মদ আর মেয়ের সঙ্গ লাভ করে দূর করেন সারাদিনের জমে ওঠা ক্লান্তি।

গান শুনে নিষিদ্ধ পল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে গেল ভুবন। এ গলা তো তার অচেনা নয়। যদিও গায়িকা চাপা গলায় গাইছে তবু এ সাগরের গলা না হয়ে যায় না।

হঠাৎ বুকের ভেতর দারুণ এক ধরণের যন্ত্রণা অনুভব করল ভুবন। সাগরের মৃত্যুর খবর শুনলেও বোধ করি এর আদ্ধেক দুঃখ পেত না সে। আজ এই পরিণতিও দেখতে হল তার মেয়ের।

এ পথে বড় একটা কেউ যাওয়া আসা করে না। কিন্তু এই জংলা

রাস্তাটাই কাউখালির দিকে যাবার সোজা রাস্তা। অবশ্য এ পথে গেলে মাঠ পেরিয়েই যেতে হয়। সন্ধ্যের মুখোমুখি পড়ে পথ কমাতে গিয়ে এই বিপর্যয়।

পা বাড়াতে যাচ্ছিল অমনি পিছন থেকে হাত ধরল একটি মেয়ে। খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, কি গা সাঁঝবেলার নাগর, বলি পালাচ্ছ কোথা ?

ভুবন বলল, হাত ছাড, আমি বাতিঘরে যাচ্ছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ঠায় দাঁড়িয়ে আছ চালতাতলায়! বলি কার কথা ভাবছিলে ?

হঠাৎ কি মনে এলো ভুবনের। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা, আচ্ছা মেয়ে, ঐ যে একটু দূরে গাছতলায় কুঁড়েটা—ওখানে কে গান গাইছে ?

গান নয় গো, ঠাকুরের নামগান। গাইছে আমাদের সাগর। পুণ্যবতী মেয়ে গো, কপালগুণে এসে পড়েছে এখেনে।

ভুবন নিজের পরিচয় না দিয়ে বলল, এখানে এসে পড়েছে মানে ?

মাসীর আমদানি গো, মাসীর আমদানি। তবে আমাদের মত পাপ কাজে নেই ও। মাসী ওকে নিজের বাড়ীর একধারে ঠাঁই দিয়েছে। রোজ ওর গলায় কেত্তন শোনা চাই মাসীর। আমরা 'আডালে আবডালে থেকে শুনি। মাসী দেখতে পেলেই তাড়া করে আসে। নরকের কীটের আবার সগ্‌গে যাবার সখ!

শেষ কথাটা বলেই আবার হেসে উঠল মেয়েটি। এবারের হাসিটা শোনাল বুক থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা একধরনের চাপা কান্নার মত।

এর পর রসদ আনবার জন্য এই পথেই যাতায়াত শুরু করল ভুবন। যদি মেয়েটার সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যায়। হলও তাই। এক দুপুরে ঐ পথ ধরে যাচ্ছিল সে। চালতাতলায় দাঁড়িয়ে আঁকশি দিয়ে চালতা পাড়ছিল সাগর। ভুবন কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকল, সাগর! অমনি হাতের আঁকশিটা মাটিতে পড়ে গেল। ঠিক চিনতে পেরেছে সাগর বাপের গলা। একটা আট বছরের মেয়ের মত পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে এসে ভুবনকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না।

শেষে বনের আড়ালে গিয়ে মেয়ে বাপে পরামর্শ হল। বাপের সঙ্গে এখুনি পালিয়ে যেতে পারে সাগর কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। বিপদের দিনে মাসী তাকে পথ থেকে ধরে এনে আশ্রয় দিয়েছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

তাকে পাপ কাজ করতে বাধ্য করেনি। আলাদা থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে চালতাতলার কুঁড়েটাতে। কাজের ভেতর ঢেঁকিতে কখনো-সখনো ধানভানা আর দুটি প্রাণীর রান্নাতে হাত লাগানো। খাইখরচা সব মাসীর। সন্ধ্যে হলে একটি দুটি করে কেত্তন শোনাতে হবে মাসীকে। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে মাসী বেরিয়ে যায় জ'হাজঘাটার দিকে খদ্দেরের খোঁজে। তখন সুযোগ বুঝে মেয়েরা এসে ভীড় জমায় সাগরের চারদিকে। কেউ বলে, সগ্‌গের দেবী গো দেবী। আবার কেউ বায়না ধরে রাধাকৃষ্ণের পালা শোনাবার জন্যে। সবার সব আবদারই রাখার চেষ্টা করে সাগর। বড ভাব জমে গেছে সাগরের এই দুঃখী মেয়ে-গুলোর সঙ্গে। তারা তাদের দুঃখের কাহিনী সাগরে৺ কাছে বলে সান্ত্বনা পায়। ওদের দীর্ঘশ্বাস সাগরের বুকে এসে বাজে।

সাগর বলল, বাবা আমি এখানে বেশ আছি।

ভুবনের গলায় উদ্বেগ; কিন্তু মা এ যে বেশ্যাপল্লী!

সাগর বলল, তোমার ঐ জমিদারের বাগানবাড়ি কি এ জায়গাটার চেয়ে ভাল ছিল বাবা?

তবু তোকে এখানে দেখলে লোকে বলবে, তুই পতিতাপল্লীর মেয়ে। তাছাড়া যারা এখানে আসে তারা তোকে উত্যক্ত করতে পারে।

সাগর বলল, এই মেয়েগুলোকে কিংবা ওদের কাছে যারা আসে তাদের বোঝা যায়, কিন্তু ভাল মানুষ সেজে সংসারে যারা ঘোরে তাদের বোঝা কঠিন।

একটু থেমে বাবার বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তুমি কিচ্ছু ভেব না বাবা, মাসীর কাছে আমি খুব নিশ্চিন্তে আছি। মাসীকে আমি বলে রাখব, তুমি যখন খুশি এসে দেখা করে যেও।

সেই থেকে কাউখালির বাতিঘরের চৌকিদার ভুবন ভক্তা মনের শান্তিতেই আছে। মেয়ে ভদ্রসমাজে থাকলে যে দুশ্চিন্তা পতিতাপল্লীতে থাকায় সে দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে সে।

॥ দুই ॥

দূরে মোহনার কাছাকাছি 'দুনিয়া' জাহাজটি নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে। কতকগুলো ছোট বড় নৌকো জাহাজের কাছে যাওয়া আসা করছে। ইতিমধ্যে কুয়াশা কেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যের আলো।

শীতের নীল জলে সে আলোর ঝিলিক। ওদিকে বালির চরে গাঙচিলের মেলা। রাতে মাছ ধরার দু-একটা নৌকো ইতিমধ্যে ডাঙায় এসে জাল থেকে মাছ ঝাড়ছে। সমুদ্রের দিকে এখনও অনেক জেলে-নৌকো ভেসে আছে।

তীরের মত জল কেটে ছুটে আসছে চারটে ছিপ নৌকো। কলকাতার খবর কাগজওয়ালাদের নৌকো ওগুলো। জাহাজ থেকে তাজা বিলিতি খবর সংগ্রহ করে খাজুরী থেকে পাড়ি দেবে ওরা কলকাতা। যে আগে পৌঁছবে তার খবর ছাপা হয়ে আগে বেরুবে। তাই শুরু হয়ে গেছে ছিপের দৌড়-প্রতিযোগিতা। এ্যাডাম আর ভুবন ভক্তা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে দূরের জাহাজটার দিকে। জাহাজ থেকে ফিরে আসছে যে সব নৌকো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেগুলোকে লক্ষ্য করছে ওরা। এ্যাডামের মনে সংশয় দানা বেঁধে উঠছে, তাহলে কি আগের চিঠির পরিকল্পনা মত দুনিরাতে আসতে গিয়েও অনিবার্য কোন কারণে এ জাহাজ ক্যানসেল করেছে অ্যানি ?

নৌকোগুলো সব একে একে তীরে এসে গেছে। মাঝিমাল্লারা পোর্ট শ্রমিকদের মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছে মালপত্র। লোকজন চর পেরিয়ে এগিয়ে আসছে সাহেবনগরের দিকে। ভোর রাতে জোয়ারের জল অনেক দূর অব্দি বেলাভূমি ভিজিয়ে দিয়ে এখন ভাটার টানে সরে গেছে। তাই অনেকখানি জায়গা ঘাসের সঙ্গে কাদাবালির মাখামাখিতে পিচ্ছিল হয়ে আছে। কয়েকজন বালুবস্তির লস্কর কুর্শিতে বসিয়ে বয়ে আনছে দুটি ইংরেজকে। জাহাজ এলে হোম থেকে অনেকেই আসে খাজুরীতে। কেউ ব্যবসার সূত্রে, কেউ চাকরি নিয়ে কেউ কলকাতার পথে, কেউ বা ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায়।

নাঃ, অ্যানি আসেনি। এ্যাডাম যখন অ্যানির আশা ছেড়ে দিয়ে ফেরার উদ্যোগ করছে তখন হঠাৎ ভুবন চেঁচিয়ে উঠল, সাহেব, ঐ একটা সাদা নৌকো জাহাজের কাছ থেকে আসছে।

ফিরে দাঁড়াল এ্যাডাম। কিছুক্ষণের ভেতর নৌকোটা ভিড়ল ডাঙায়। এ্যাডাম জানে ঐ নৌকোয় ক্যাপ্টেন কিংবা দু'নম্বর তিন নম্বর অফিসাররাই যাতায়াত করে। হ্যাঁ ঐ তো, একটি মেয়ের হাত ধরে এগিয়ে আসছে একটি পুরুষ। সাহেবনগরের দিক থেকে কুর্শি নিয়ে পিছল বেলাভূমির ওপর দিকে ছুটছে দুটো মাজা। তারা কাছাকছি পৌঁছে গেছে। হাত নেড়ে কি কথা হল। ফিরে যাচ্ছে শূন্য কুর্শি সাহেবনগরের দিকে। ওরা দুজনে এগিয়ে

আসছে হাত ধরাধরি করে পোর্ট অফিস লক্ষ্য করে।

অ্যানি। অ্যানি! দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল এ্যাডাম।

অ্যানি উত্তেজনায় হাত নেড়ে দৌড়তে গিয়ে পিছল মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, সঙ্গীটি জোর করে হাত ধরে টেনে তাকে পতনের হাত থেকে বাঁচাল।

কাছে আসতেই এ্যাডাম কতক্ষণ ছোট বোনের মাথাটা চেপে রইল বুকের মধ্যে। জাহাজের মিডশিপম্যান অভিবাদন বিনিময় করে চলে গেল পোর্ট অফিসের দ‍ে ।

ভুবন বলল, কোন্ পথে যাব সাহেব?

এ্যাডামের সোজা উত্তর, যে পথ দিয়ে আসা হয়েছে।

কিছুটা ইতস্তত করে ভুবন বলল, কিন্তু হুজুর, আপনি ওপথে চলতে পারেন, মেমসাহেব কি পারবেন?

অফকোর্স, অ্যানি আমার বোন আছে। পারবে না মানে! ও, তোমার ঐ কি যেন আছে মাঠে?

কি হুজুর?

ধান্যবৃক্ষের গোড়া।

নাড়াবুদা।

হো-হো করে হেসে উঠে অ্যানির দিকে চেয়ে এ্যাডাম বলল, নাড়াবুড়া, নাড়াবুডা।

ফ্যাল ফ্যাল করে দাদার দিকে তাকিয়ে অপরিচিত শব্দের ধ্বনি বৈচিত্র্যে পুলকিত হয়ে উঠল অ্যানি!

সেই চালতা তলার পথ পেরুতে গিয়ে অ্যানি অবাক হয়ে দেখল, খড়ে ছাওয়া ঘরের সামনে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি মেয়ে। চোখে উৎসুক দৃষ্টি!

অ্যানি জানে না ওরা কারা। কয়েকটি এদেশীয় মেয়েকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে সে তো মুগ্ধ। পারলে যেন তখুনি ভাব জমায়। ভুবন ভক্তা ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে জোর কদমে মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

এ্যাডাম অ্যানির হাত ধরে ভুবনের পিছু ধাওয়া করতে করতে বলল, অশ্বের মত লম্ফ দিয়ে যাচ্ছ কেন? ধীরে ধীরে পা চালাও।

মাঠের শিশির অনেক আগেই শুকিয়ে গিয়েছিল, তাই পতনের সম্ভাবনাও কমে গিয়েছিল। তবু উঁচু নীচু এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে চলতে

অ্যানির শৌখিন জুতোয় ঠোকর লেগে রঙ চটল। দু-একবার পড়তে পড়তে টাল সামলাল দাদার হাত ধরে। শেষে বোনকে সামলাতে গিয়ে একবার ভাই বোন দুজনেই পড়ল।

নির্জন পরিবেশে বাতিঘরের সুন্দর সংসারটি বড় ভাল লেগে গেল অ্যানির। কাউখালির চওড়া খালে সমুদ্রের জোয়ার এলে থৈ থৈ ভরে গিয়ে কূল উপচে ওঠে। মেছো নৌকোগুলো বাঁশের খুঁটি পুঁতে জাল পাতে। ভাটার সময় নৌকোতে জাল গুটিয়ে মাছ ঝেড়ে নেয়। মহা ব্যস্ত হয়ে মাছের লোভে পাখিগুলো এলোপাথাড়ি উড়ে বেড়ায়। বাতিঘরের জানালা দিয়ে সে দৃশ্য দেখে অ্যানি খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে। রাতের খালের বাঁকে বাঁকে জেলে নৌকোয় টেমির আলো জ্বলে। চারতলায় নিজের বিছানায় শুয়ে অনেক দূর অব্দি সেই টুকরো টুকরো ছবি দেখে অ্যানি। রাতে কখনো বা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় একেবারে ওপরে, যেখানে আলো জ্বলছে, আমানত অথবা ইয়ার আলি বসে আছে। ওরা অ্যানিকে দেখলেই উঠে দাঁড়ায়। অ্যানি ওদের বসতে বললেও বসে না। বাতিঘরের আলো উত্তর ও উত্তর পূর্বে ছিয়ানব্বই ডিগ্রিতে ছড়িয়ে পড়ে। অর্ধবৃত্তাকার ঐ আলো মেঘ ও কুয়াশামুক্ত রাতে প্রায় পনেরো মাইল অব্দি দেখা যায়। রাতে ঐ বাতিঘরের আলোয় গঙ্গার মোহনার বিপুল জলরাশির দৃশ্য দেখে অ্যানি। কখনো অদূরে দেখা যায়, জল কেটে জাহাজ চলেছে খাজুরী ঘাটের দিকে। জ্যোৎস্না রাতে সমস্ত চরাচরই মায়াময়। বাতিঘরের উত্তরে ঝাউগাছ এর বন। কোন বসতি নেই সেখানে। গামা, গরান, হাব্‌লি গাছের জঙ্গল। দু-একটা সরু সরু নাশিখাল বনের ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়েছে কাউখালির প্রশস্ত খালে। এ সব ছোট ছোট নালার মত খালেও জোয়ার ভাটা খেলে। দূরে কাছে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা এই সব নাশিখালে চেঁওয়া, খলসা মাছ ধরে। তাছাড়া খালের পাশের গর্তে সুন্দ্‌রা কাঁকড়া বসে থাকে। দড়ির আগায় শুঁট্‌কি মাছ বেঁধে গর্তের ভেতর ফেলে দেয় ছেলেমেয়েরা। শুঁট্‌কি কামড়ে ধরলেই হাতের বশে টেনে তোলা হয় কাঁকড়াকে। তাছাড়া মাছ ধরার ফন্দিফিকির যাদের একেবারে রপ্ত তারা গর্তের ভেতরেই হাত চালিয়ে তুলে আনে কাঁকড়া। ধারালো দাড়ার কামড়ে রক্তাক্ত করে দেয় হাত। ওতে কিন্তু মাছ ধরার নেশা যায় না।

এ সব দেখতে ভালবাসে অ্যানি। সে একা একা ঐ সব ঝাউগাছ-এর

জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তাকে দেখলেই মাছ ধরা ফেলে রেখে গ্রামের অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। অ্যানি ওদের সঙ্গে খালে নেমে মাছ ধরতে চায়। ভাটার যখন নাশিখাল প্রায় জলশূন্য হয়ে যায় তখন কাদার ভেতর নেমে সবাই কাদায় আটকে পড়া মাছ তুলে নেয়। একদিন অ্যানি কাদায় নেমে মাছ ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে পোশাক-আশাক কাদায় মাখামাখি করে ফিরল লাইট হাউসে। এ্যাডাম বোনকে এ জন্যে সাবধান বা মৃদু ভর্ৎসনাও করল না। সে নিভৃতে চৌকিদার ভুবন ভক্তাকে কাছে ডেকে বলল, এ দেশের সবকিছু অ্যানির ভারী পছন্দ হয়ে গেছে। কিন্তু ও এ সব জায়গার হালচাল আর নদী-নালার খবর কিছুই জানে না। তুমি এমন একটা মেয়ে যোগাড় করে দাও যে অ্যানির সঙ্গে সব সময় থাকতে পারবে।

ভুবন ভক্তা খানিক চিন্তা করে বলল, চেষ্টা করে দেখব হুজুর।

এ্যাডাম বলল, চেষ্টা নয়, আমার কিন্তু জলদি চাই। অ্যানি ভীষণ কৌতূহলী। হঠাৎ কোন বিপদে না পড়ে যায়। আর তাছাড়া আমি যেমন তোমাদের দেশের ভাষা শিক্ষা করে নিয়েছি ও-ও তেমনি শিক্ষা করতে চায়। ওর মত বয়সের একটা বন্ধু হলে খুব উত্তম হয়।

ভুবন মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা হুজুর। 'ওর মত বয়েসের একটা বন্ধু'—কথাটা শোনামাত্রই ভুবনের চোখের ওপর একটা মুখ ভেসে উঠল।

দুপুরে খাবার পাট চুকলে ভুবন ছুটল চালতাতলার সেই নিষিদ্ধপল্লীর দিকে।

মাসী তখনও বের হয়নি জাহাজঘাটায় খদ্দেরের খোঁজে। চুল বেঁধে দিচ্ছিল সাগরের। ভুবন হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়ল।

মাসী দাওয়ায় চাটাই পেতে দিতে দিতে বলল, অবেলায় কি মনে করে বেয়াই?

ভুবনের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা না থাকলেও মাসী ভুবনকে বেয়াই বলেই ডাকত। মাসী মানদাসুন্দরী এ অঞ্চলের এক ডাকসাইটে নায়েবের রক্ষিতা ছিল। পশ্চিমে ঘর আর স্বামী ছিল মানদার। সুন্দরী বউকে আগলে রাখার শক্তি বা সামর্থ ছিল না মানদার স্বামীর। চাষাভুষো লোকটাকে বিঘে দুই জমি দিয়ে নায়েব তার সুন্দরী বউটাকে তুলে নিয়ে এসেছিল এই জালপাই মহলে। শেষে নায়েব যখন কঠিন রোগে পড়ল তখন তাকে প্রাণ দিয়ে সেবা করল মানদা। নায়েবও তার শেষ সময়ে মানদাকে লিখে পড়ে

ছিল এ জায়গাটা। হুঁসিয়ার মানদা কিছু টাকা পয়সাও সরিয়েছিল। সায়েব মারা যাবার পর সে দু-একখানা করে ঘর তুলল। জাহাজঘাটার কাছে তখন গড়ে উঠেছে সাহেবনগর। ব্যবসা বাণিজ্যে খাজুরীর তখন রমরমা অবস্থা। কত লোকজনের সে সময় নানা কাজে আসা যাওয়া। কলকাতা, হুগলীর যাত্রীরা দূর দেশ থেকে জাহাজে এসে ক'দিনের জন্যে বিশ্রাম নিত খাজুরীতে। বড জাহাজ তখন গঙ্গার মোহনায় খাজুরীতেই নোঙর ফেলত। হুগলী নদী উজিয়ে কলকাতা যাবার পথ বিপজ্জনক ছিল। খাজুরী থেকে যাত্রীরা 'স্লুপ' নামের ছোট জাহাজে মালপত্র নিয়ে কলকাতা যেত। তাদের দেহ মনের বিনোদনের জন্য খাজুরীতে পতিতালয়ের প্রয়োজন দেখা দিল। মানদাসুন্দরী এই সুযোগটা কাজে লাগাল। বিধবা, গৃহত্যাগী, অন্নবস্ত্রহীন মেয়েদের যোগাড করে এনে সে ব্যবসা ফাঁদল। মানদার বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার গুণে দিনে দিনে জমে উঠল ব্যবসা।

ভুবন এ্যাডাম সাহেবের ইচ্ছার কথাটা খোলাখুলি জানাল মানদাকে। বলল, সাগর এখন তোমার মেয়ে। তুমি তাকে বিপদে ঠাঁই দিয়েছ। তুমি এখন তাকে অনুমতি না দিলে আমার সাধ্য কি নিয়ে যাই।

অনেক ভাবল মানদা। মেয়েটাকে সত্যিই সে ভালবেসে ফেলেছিল। ওকে পাপ ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিলে অনেক অনেক টাকা সে কামাতে পারত, কিন্তু মেয়েটার গলায় প্রথম দিন রাধাকৃষ্ণের গান শুনে সে এমনই মোহিত হয়ে যায় যে তাকে আর পাপ কাজে লাগাতে প্রাণ চায়নি। মানদা আজকাল সাগরের গান শুনত আর ভাবত এই পাঁকের পুকুরে সাগরই তার একটি মাত্র পদ্ম, যে তাকে হয়তো একদিন ঠাকুরের চরণে যাবার পথ দেখাবে।

তবু যেতে দিতে হল সাগরকে বাপের সঙ্গে। নিজের মেয়ে হলেও ভুবন জোর জুলুম করল না, তার বিবেচনার ওপরই সবটা ছেড়ে দিল। এ অবস্থায় অনুমতি না দিয়ে কি পারা যায়। আর তাছাড়া সাহেব চেয়েছে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেয়।

যাবার সময় শুধু বলল, নিয়ে যাও, কিন্তু মাঝে মাঝে একটিবার করে দেখিয়ে নিয়ে যেও মেয়েটাকে। ও ছিল আমার পাপের গাঙে একমাত্র পারাণির কড়ি।

দুঃখী মেয়েগুলো সবাই এসে ভীড় করল সাগরের চারদিকে। আজ আর মাসী ওদের ধমক দিল না, সরে যেতেও বলল না। মাসী দুপুরে

জাহাজঘাটার দিকে চলে গেলে ওরা চুপি চুপি চলে আসত সাগরের পাশে। গান শুনত আর নিজেদের পাপ জীবনের কথা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। ওরা জানত, এ জীবন থেকে ওদের মুক্তি নেই। মাসী ছেড়ে দিলেও মুক্তি নেই, পালিয়ে গিয়েও নয়। পেটের জ্বালা যত দিন ততদিন জ্বলতে জ্বলতে এখানেই থাকতে হবে। একবার একটা মেয়ের দেহে কি খারাপ রোগ ঢুকেছিল। যন্ত্রণায় পাগলের মত কাতরাত। ভাল হল না তুকতাক, জড়িবুটিতে। শেষে মেয়েটা গাঙে ডুবে সব জ্বালা জুড়াল। মা হবার স্বপ্ন দেখে ওরা। বর্ষার দিনে অদূরে চাষের জমিতে চাষাভুষোরা কাজ করে। তালপাতার তৈরি 'পাখিয়া' মাথায় দিয়ে আসে চাষার বউ। পান্তাভাত নিয়ে আসে খাবার জন্যে। বায়নাদার ছেলে কথা শোনে না। বর্ষার জলে ভিজে মায়ের আঁচল ধরে আসে পিছন পিছন। কখনো চডচাপড় খেয়ে তুমুল সোরগোল তুলে কাঁদে। আবার পরক্ষণেই মা তাকে বুকে জড়িয়ে আদর করে চুমু খায়—কুঁড়েঘরের ঝোর্‌কা দিয়ে অভাগী মেয়েরা এ সব ছবি দেখে আর বুকের মধ্যে মোচড দিয়ে ওঠে। চোখ মুছে আবার পেটের জ্বালা ঘোচাবার কাজে লেগে যায়। তাদের কাছে এ ছবি একটা মিথ্যা স্বপ্ন বলেই মনে হয়। অথৈ সমুদ্রের মাঝে এক চিল্‌তে চর ছিল সাগর। ডুবে যেতে যেতেও চরটুকুকে অবলম্বন করে একটুখানি হাঁফ ছাড়ার সুযোগ পেত। এখন পায়ের তলার সব আশ্রয় সরে গেল। যতটুকু সময় লোনা জলে হাত পা ছুড়ে বাঁচা যায় এখন। তারপর অতলে মরা মাছের মত তলিয়ে যাওয়া।

।। তিন ।।

সাগরকে মনে ধরেছে অ্যানির। শুধু মনে ধরা নয়, হাত ধরে ঘুরছে সকাল সন্ধ্যে। প্রায় একই বয়েস দুজনের। কেউ বোঝে না কারু ভাষা, তাতে কি এসে যায়। মনের কথা ঠিকই বোঝে সমবয়সী।

এতদিনে ভুবনের যেন পুরো দম এসেছে বুকের মধ্যে। শূন্যতাটা ভরাট হয়েছে মেয়েকে কাছটিতে পেয়ে। প্রথম রাতটি লাইটহাউসের নীচে চৌকিদারের ডেরায় কাটিয়েছিল সাগর। পরের রাত থেকে একেবারে অ্যানির ঘরে। অ্যানির শুধু দিনে নয়, রাতেও সাগরকে কাছে চাই। অনেক রাত অব্দি দুই ভিন্‌দেশী সখির গল্পগুজব চলে। দুজনের ভাষা ভিন্ন। কেউ কারু কথা বোঝে না। তবুও। অ্যানি হয়তো বলল, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

সাগর ইংরেজী ভাষার অর্থ না বুঝে উত্তর করল, আমি কক্ষনো এত উঁচুতে শুয়ে রাত কাটাইনি।

অ্যানি সাগরের শেষের কথাটাতে ইঁদুরের গন্ধ পেল। 'রাত' হয়ে গেল 'র‍্যাট'। অমনি বিছানার ওপর উঠে বসে ভীতু গলায় বলল, এখানে ইঁদুর আছে নাকি?

সাগরও ততক্ষণে উঠে বসেছে। জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছে চাঁদের আলো। সে বুঝতে পারল না অ্যানি কেন বিছানার ওপর উঠে বসল। তবে অ্যানির চোখে মুখে যে ভয়ের চিহ্ন তা চাঁদের আলোতেও দেখতে পেল।

সাগর অনুমান করল অ্যানি ভূতের ভয় পেয়েছে। সে অমনি হাত নেড়ে নেড়ে সাহস দিয়ে বলল, না না, ভূত নেই। ভূত থাকলে ঠিক বাবার চোখে পড়ে যেত।

সাগরের হাত নাড়া দেখে অ্যানি কিছুটা আশ্বস্ত হল। তার ঘরে যে ইঁদুর ঢুকে পড়েনি এটা সে বুঝতে পারল। সে তখন জানালার ধারে গিয়ে নিচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, তাহলে কি ঐ নিচে আছে?

এবার সাগর ভাবল জালপাই-এর জঙ্গলে ভূত আছে কিনা তা জানতে চাইছে অ্যানি। সে অমনি মাথা নেড়ে জানাল, ওখানে ভূত থাকলেও থাকতে পারে।

এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে অ্যানি শুয়ে পড়ল বিছানায়।

অ্যানি বাংলা শেখে, সাগর শেখায়। কড়া, খুন্তি, সাগর, নদী, বন, পথ বিছানা, হাসি-কান্না শেখা চলল, কিন্তু আসল শেখা হবে কি করে? অর্থবোধক বাক্য শেখানোই দায় হল। সাগর ইংরেজী জানে না।

অ্যানিকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো তার দাদা এ্যাডাম। তিন বছরের চাকরি জীবনে এ্যাডাম দুর্দান্ত বাংলা শিখেছে। প্রথম দিকে সাহেবনগরে গিয়ে অনেক পুরোনো অভিজ্ঞ সাহেবদের কাছ থেকে। তারপর নিজের শেখার প্রচণ্ড তাগিদেই সে এদেশী মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। শিখে গেছে বহু শব্দ, বহু কথা। অনর্গল কথা চালিয়ে যেতে তার একটুও বাধে না আর। সেই হল এখন অ্যানির আসল শিক্ষক। অ্যানি যেমন কৌতূহলী তেমনই গভীর। শেখার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। সে খুব কম দিনের ভেতরেই অনেক কিছু আয়ত্ত করে ফেলল। এখন পথে-ঘাটে সাগরের সঙ্গে চলতে ফিরতে সে এ দেশের ভাষাতেই কথা বলতে লাগল।

সাগরেরও সুবিধে হল অ্যানিকে কথাবার্তায় অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে। একটি বছর যেতে না যেতেই অ্যানি এ দেশীয় ভাষায় পরিষ্কার ভাবপ্রকাশ করতে শিখে গেল।

সমুদ্রকূলে চওড়া বাঁধ। সে বাঁধ কয়েক মাইল ব্যাপী বন্দর বেষ্টন করে চলে গেছে। সমুদ্রের ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস এ অঞ্চলে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তাই এই উঁচু বাঁধ সমুদ্রের বন্যা প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়েছে।

বাঁধের ওপর একটি বটগাছ শাখাবাহু বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই নীচে বসে গল্প করছিল অ্যানি আর সাগর। তখন পশ্চিমে ডুবন্ত সূর্য আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে লাল আবীর। তার প্রতিবিম্ব পড়েছে সামনে অথৈ নীল জলে। দু-দশটি প্রায়-উলঙ্গ গ্রাম্য ছেলে একপাল গরু তাড়িয়ে নিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে অদূরে গ্রামের দিকে চলে গেল।

অ্যানি হঠাৎ সাগরের দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা সাগর, একটা কথা তোমাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা যায়।

সাগর তাকাল অ্যানির মুখের দিকে।

অ্যানি বলল, তোমার চেহারার সঙ্গে এখানকার লোকজনদের চেহারার মিল নেই কেন?

আমার বাবা এ অঞ্চলের মানুষ কিন্তু আমার মায়ের রক্তের সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের রক্ত মিশে আছে।

অ্যানির আবার প্রশ্ন, ফিরিঙ্গী কারা?

সাগর বলল, পর্তুগীজরা এ দেশের মেয়ে বিয়ে করে যে-সব ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়েছে তাদেরকেই সাধারণত ফিরিঙ্গী বলে। তবে এখন পর্তুগীজ মাত্রেই এ দেশের মানুষের ভাষায় ফিরিঙ্গী।

শুনেছি পর্তুগীজরা এ এলাকায় খুব অত্যাচার চালিয়েছিল।

ঠিকই শুনেছ অ্যানি। আমার চেহারায় আর রক্তে তাদের কিছু চিহ্ন আছে বলে আমি লজ্জিত।

না, তোমার লজ্জার কিছু আছে না।

জানো অ্যানি, কোম্পানির এখানে আসার আগে পর্তুগীজ আর মগেরা মিলে এ অঞ্চলটাতে লুঠতরাজ চালিয়ে শ্মশান করে দিয়ে গেছে।

দেশে থাকতে শুনেছিলাম, ওরা এ দেশের মেয়ে পুরুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে ইউরোপে বিক্রি করে আসত।

সাগর বলল, এখানকার বুড়ো মানুষদের মুখে পর্তুগীজদের লুঠতরাজের অনেক গল্প শুনেছি। তাঁরাও আবার তাঁদের বাপঠাকুর্দার মুখ থেকে শুনেছেন।

হঠাৎ অ্যানি বলল, সন্ধ্যার মুহূর্তটি বড় ঘন হয়ে উঠেছে। তুমি আমাকে ফিরিঙ্গীদের একটা কোন গল্প শোনাতে পার সাগর?

সাগর বলল, শুনতে চাও, নিশ্চয়ই শোনাব। আচ্ছা কনকলতার গল্পটাই বলি।

অ্যানি মুগ্ধ শ্রোতার মত চেয়ে রইল সাগরের মুখের দিকে। সাগর দক্ষ গল্প বলিয়ের মত বলে যেতে লাগল কনকলতার করুণ কাহিনীটি।

প্রথম ঢেউ আছড়ে ফেলে দিল কনকলতাকে বালুতীরে। দ্বিতীয় ঢেউটা আরও বেগে এসে ধাক্কা মারল। কনকলতা পাক খেয়ে গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকল একটা উঁচু বালির ঢিবির গায়ে।

সে জ্ঞান হারিয়েছিল। পড়েছিল জনমানবের চিহ্নহীন সমুদ্রতীরে। অন্ধকার আকাশ জ্বলজ্বলে তারার চোখ মেলে দারুণ বিস্ময় নিয়ে দেখছিল তাকে। সন্ধ্যার ছায়া ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারারা দেখেছে তাকে সমুদ্রের জলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

রাত কত ঠাওর করার উপায় নেই। কনকলতা চোখ মেলল। তখনও কানের ভেতর সমুদ্রের একটানা এক শব্দ বেজে চলেছে।

কনকলতা শুয়ে শুয়েই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, তার একটু দূরেই কতকগুলো গাছের জটলা। অন্ধকারে ডালপাতা দেখা না গেলেও সব মিলিয়ে গাছের অস্তিত্ব চিনে নিতে তার অসুবিধে হল না।

হঠাৎ কতকগুলো জোনাকী অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর থেকে আলোর ফুল্‌কির মত ছিটকে বেরিয়ে এল।

ভয় পেয়ে চোখ বুঁজল কনকলতা। কিন্তু চোখ বুঁজেও রক্ষা পেল না। ছবি ফুটে উঠল তার চোখের ওপর। আলোয় আলোয় সাজানো ঘর। তখনও বর আসেনি। সবার মুখে উদ্বেগের ছায়া। প্রথম লগ্নটিতে বুঝি আর বিয়ের কাজ শেষ করা গেল না। এদিকে কনকলতা সেজে বসে আছে।

কে যেন বললে, ঐ যে বর আসছে। অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে ওদের বাদ্যি বাজনা। আকাশ জুড়ে চলছে রোশনাই।

সবাই ছুটল বাইরে কনকলতাকে ছেড়ে। সখীরা কেউ নেই তার পাশে। সে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আড়াল থেকে দেখতে লাগল আকাশে বাজীর খেলা। ঠিক আজকের মতই রাশি রাশি জোনাকীর ফুল্‌কি অন্ধকার আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

সে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ রোশনাইয়ের খেলা দেখছিল তা তার মনে নেই, কিন্তু হঠাৎ বাইরে একটা আতঙ্কের কোলাহল শুনে তার সংবিৎ ফিরে এল।

ফিরিঙ্গী। ফিরিঙ্গী দস্যু। বর সেজে আসছে। চীৎকার করে উঠতে গেল কনকলতা, কিন্তু গলা দিয়ে একফোঁটা আওয়াজ বেরোল না। তার মনে হল বিরাট একটা থাবা কে যেন তার মুখে বসিয়ে দিয়েছে। দম আটকে আসছে তার। কারা তার মুখ বেঁধে ফেলল। ঘোড়ার ওপর তুলল। তারপর সামনের দিকে চালিয়ে নিয়ে চলল এক অসীম শক্তিশালী মানুষ।

তাকে ঘোড়া থেকে একটা নৌকোয় তোলা হল। নৌকো থেকে একটা পাল-তোলা জাহাজে।

সে প্রায় মূর্ছিতের মত পড়েছিল একটা কাঠের মেঝের ওপর।

কত রাত সে জানে না, একটা মানুষ ঢুকল তার ঘরে। এক ঝলক আলো এসে পড়ল তার চোখে। সে হাতের পাতায় মুখ ঢাকল।

মানুষটাকে এক পলকে দেখেছে সে। ধবধবে সাদা রং, লালচে চুলের গুচ্ছ। এক ঝলকেই দেখেছে কনকলতা মানুষটা বাঙালীদের মত বিয়ের সাজ পরেই ঘরে ঢুকেছে।

একটা মেয়ে তার সঙ্গে ছিল, আলো নিয়ে এসেছিল হাতে। মেয়েটা পরেছিল লুঙ্গীর মত একটা পোশাক। বুকের জামাটা কোমর অবধি এসে পড়েছিল।

কনকলতার মনে হল মেয়েটি বেরিয়ে গেল বাইরে। মানুষটা দরজা বন্ধ করে দিল ভেতরে থেকে।

কাঁপছে কনকলতা। সুন্দরী আর ডানপিটে বলে সুনাম দুর্নাম দুটোই ছিল তার। কিন্তু সেই মুহূর্তে কনকলতার বুকখানাতে কে যেন ঢাকের বাড়ি বাজাতে লাগল।

মানুষটা এসে বসেছে তার পাশে। পোশাকের খস খস আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছে। কাঠের মেঝেতে পাতা কার্পেটের ওপর বসে নিশ্চয়

মানুষটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

পরিষ্কার বাংলায় একটা কথা তার কানের কাছে কে যেন উচ্চারণ করল, কনকলতা উঠে বোস।

কনকলতা চমকে সত্যিই উঠে বসেছিল। সে ভাবতেই পারেনি একেবারে বিজাতীয় মানুষটার গলা থেকে এমন ভাষা বেরোবে।

সে অবাক হয়ে চেয়েছিল মানুষটার মুখের দিকে।

আমি তোমাকে ভালবেসেছি কনকলতা। তুমি খুব সুন্দর। তুমি আমার কাছে থাক। তোমার কোন দুঃখ থাকবে না।

সেই মুহূর্তে আবার কনকলতার অসাড় ভাবটা এল। তার চোখের ওপর ফুটে উঠল মায়ের মুখখানা।

কনকলতা মেঝের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আকুল আবেগে কেঁদে উঠল।

কাঁদতে কাঁদতে শ্রান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই, চোখ মেলতেই দেখল ঘরের আলো নিভে গেছে। দুলে দুলে চলছে জাহাজ। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে এসে পড়েছে বাইরের একফালি চাঁদের আলো।

মানুষটা তারই পাশে কাজ-করা একটা চৌকীর ওপর শুয়ে আছে। চাঁদের আলোটা পড়েছে সোজা তার মুখের ওপর।

উঠে বসল কনকলতা। আড় চোখে চেয়ে দেখল লোকটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এমন সুন্দর দেহের মানুষ সে তার চারদিকে আর কখনও দেখেনি।

তার মনে হল, খুনী নরপিশাচ ডাকাতের সর্দারের চেহারা কি এত সুন্দর হয় কখনো।

মগ আর ফিরিঙ্গীদের কত কাহিনী সে শুনেছে। শুনতে শুনতে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার সারা শরীর। গাঁয়ের পর গাঁ উজাড় হয়ে গেছে ওদের অত্যাচারে। কত গঞ্জের বাজার বন্ধ হয়ে গেছে মগ-ফিরিঙ্গীদের আতঙ্কে।

চারদিন জলে ভাসতে ভাসতে অবশেষে এক দ্বীপে এসে লাগল জাহাজটা।

ঐ জাহাজ থেকে গোনাগুনতি জনা দশেক নামল সেই দ্বীপে। ফিরিঙ্গী সর্দারের নামটা জানা হয়ে গেছে কনকলতার। ইমানুয়েল। মানুষটা এখনও তার ওপর কোনরকম জোর দেখায়নি। আর তাই কনকলতা প্রথম দিনে খাবার না খেলেও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভাবেই তার আহার্য গ্রহণ করেছে।

নতুন দ্বীপে নৌকোয় করে নামল ওরা। তলোয়ার উঁচিয়ে সামনে

দুজন। তার পরেই চলেছে সর্দার ইমানুয়েল। ধবধবে সাদা পোশাক। প্রান্ত-গুলোতে লালের বর্ডার দেওয়া। সোনালী একটা মোটা ফিতে চলে গেছে আড়াআড়ি ভাবে বুকের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। কোমর থেকে কালো খাপে ঝুলছে তলোয়ার।

ঠিক তার পেছনেই চলেছে কনকলতা আর ঐ মগ মেয়েটা পাশাপাশি। সবশেষে জনা পাঁচেক মানুষ। চাকর-রাঁধুনি বলেই মনে হয়।

একটা চওড়া বন ভেদ করে ওরা এসে পৌঁছল একটা ফাঁকা জায়গায়। দুটো ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। পাশেই সহিস।

কনকলতার মনে হল, ওরা জাহাজ থেকে নামার আগেই নৌকো করে কেউ এসে এখানে খবর দিয়ে ঘোড়া দুটো আনিয়ে রেখেছে।

ইমানুয়েল একটা ঘোড়ায় উঠল। মগ মেয়েটা অন্য ঘোড়ার পিঠে কনকলতাকে উঠে বসতে সাহায্য করল। ঘোড়ার পাশে পাশে হেঁটে চলল অন্য সবাই।

ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে আবার বন। সে বনে সুন্দর তৈরী পথ। ফলের গাছও চোখে পড়ল পথের ধারে ধারে।

ঘোড়ায় চড়ার অভ্যেস নেই কনকলতার। তবু ডানপিটে মেয়ে বলে সিধে বসে রইল ঘোড়ার লাগাম ধরে। টলল না একদম, অবশ্য ঘোড়াটা একটুও মেজাজ খারাপ করেনি, তাই রক্ষে।

বন পেরিয়ে সাজানো নারকেল-সুপুরীর বাগান। ঠিক তার পরেই ঘাট-বাঁধানো বড় পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ওপারে বিরাট বড় একখানা বাড়ি।

কনকলতাকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল আরাকানী মেয়েটি।

ওরা ঢুকল ঘরের ভেতর।

দু'মহল্লা পেরিয়ে একেবারে অন্দর-মহলে নিয়ে যাওয়া হল কনকলতাকে।

সাজানো ঘর। সুন্দর কারুকার্য করা পালঙ্কে বিছানা পাতা। ঘরের দেয়ালে নানা ধরনের রঙীন ছবি টাঙানো।

এখানে বস, আমি ঝোরকা খুলে দিচ্ছি।—মেয়েটি বলল।

বলেই পেছনের ঝোরকা খুলে দিল।

কনকলতা বসল না। সে ঝোরকা-পথে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল।

কয়েকটা গাছ দাঁড়িয়ে। তার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র। গাছ থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে বালির চর।

জায়গাটা চোখ জুড়িয়ে দেবার মত। তবে কনকলতার মনের কাতরতা যায়নি, তাই সে উদাস চোখে সেদিকে চেয়ে রইল।

ছায়ার মত পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরাকানী মেয়েটি।

কনকলতা বলল, আমার এখন কিছু দরকার নেই, তুমি নিজের কাজে যেতে পার।

মেয়েটি বলল, এখানে কিন্তু মেঝেতে বসার অথবা শোবার চেষ্টা কোর না। এটা কাঠের মেঝে নয় যে শুকনো থাকবে। সমুদ্র একেবারে সামনে, তাই মেঝেতে জল চুঁইয়ে ওঠে। স্যাঁতসেতে ভাবটা যায় না। ইচ্ছে হলে পালঙ্কের ওপর বসবে, এটা তোমার ঘর।

কনকলতা মাথা নেড়ে জানাল, সব কথা সে বুঝতে পেরেছে, তার দরকার হলে তাই করবে।

মেয়েটি বেরিয়ে গেল।

কনকলতা ভাবল, এ আবার কোন জগতে এসে পড়ল সে। সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ। দ্বীপের ভেতর এমন বন আর অট্টালিকা।

রাতে তার ঘরে এল ইমানুয়েল। সারাদিন লোকটিকে বিশেষ দেখা যায়নি। অন্ততঃ কনকলতার কাছে আসেনি। দূর থেকে যতটুকু দেখা গেছে তাতে বিদেশী পোশাক পরে ইমানুয়েলকে ঘুরতে দেখেছে সে। কিন্তু রাতে তার কাছে এল একেবারে অন্য বেশে। পরে এল পরিচিত বাঙালীদের মত পোশাক পরিচ্ছদ। কনকলতার মনে হল, জামাইরা যে ধরনের পোশাক পরে শ্বশুর বাড়ি আসে, তেমনি সেজে-গুজে।

ইমানুয়েল দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। মুখে তার প্রসন্ন একটা হাসির রেখা। দেখলে কে বলবে, এই মানুষটার তলোয়ারের আগায় বিষাক্ত সাপের ছোবল লুকিয়ে আছে। কত মানুষের বুকে হাহাকার তুলে লোকটা ছিনিয়ে আনছে তাদের বুকের ধন!

ইমানুয়েল বলল, তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

কনকলতা মাথা নেড়ে জানাল, তার কোন কষ্ট হয়নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনের ভেতর চেপে রাখা বৃহৎ কষ্টটা উঠে এল তার বুক ঠেলে। চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কনকলতা দাঁড়াল জোরকার দিকে মুখ ফিরিয়ে। সে নিজেকে একটুখানি সামলে নিতে চায়।

আবার ইমানুয়েলের গলা বেজে উঠল, তুমি কি আমাকে একটুও ভালবাসতে পার না কনকলতা?

কনকলতা ক'দিন ধরে ভেবেছে নিজের ভাগ্যের কথা। সে জানে, পথ নেই তার পালাবার। আর এও সে জানে, এখন মুক্তি পেলেও সমাজ ফিরিঙ্গীর এঁটো বলে তাকে কোথাও ঠাঁই দেবে না।

সে ইমানুয়েলের দিকে ফিরে দাঁড়াল। এখন তার আর কোন ভয় করছে না। সে বড় বড় মোহময় দুটো চোখ মেলে তাকাল।

ইমানুয়েলের অভিজ্ঞ চোখ বুঝল কনকলতার চোখে আমন্ত্রণের ঝলকানি না থাকলেও প্রত্যাখ্যানের নিস্পৃহতা নেই।

ইমানুয়েলের মুখে তেমনি বিশ্বজয়ী হাসি। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। কনকলতা দেয়ালে হেলান দিয়ে চেয়ে রইল ইমানুয়েলের মুখের দিকে। ভয়ে কাঁপল না তার চোখ, নড়ে উঠল না তার দেহ।

চার চারটে মাস ঐ দ্বীপেই বাঁধা রইল ইমানুয়েলের জাহাজ। ইমানুয়েল এখন অন্য মানুষ। কোন দিন যে সে খুনী ছিল তা বোঝার উপায় নেই। মেয়ে-পুরুষ ধরে এনে হাতের পাতা ফুটো করে বেতের সরু ছিলায় যে সবাই-কে একসঙ্গে বেঁধে রাখত, সে পিশাচের সঙ্গে আজকের ইমানুয়েলের কত তফাত।

কনকলতার অনুরোধে সে জাহাজের খোলের ভেতরে পড়ে থাকা হত-ভাগ্যদের হাত থেকে বেতের বাঁধন খুলে দেবার 'আদেশ দিয়েছে। মুরগী-দের খাবার দেবার মত যে অসহায় বন্দীদের ওপর সারাদিনে সামান্য কিছু খাবার ছড়িয়ে দেওয়া হত, তার বদলে মানুষের মত খাবার দেবার আদেশ জারি করেছে ইমানুয়েল। কনকলতার কথা সে এড়াতে পারেনি। কনকল-তাকে দারুণ ভাবে মনে ধরেছে ইমানুয়েলের।

বনের একটা নির্জন প্রান্তে সকাল-সন্ধ্যা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ায় ইমানু-য়েল আর কনকলতা।

ঘোড়া থেকে নেমে ওরা বিশ্রাম করে গাছের ছায়ায়। কনকলতার কোলে মাথা রেখে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ে থাকে ইমানুয়েল। কনকলতা চেয়ে চেয়ে দেখে মানুষটাকে।

এক সময় খেয়াল হল ইমানুয়েলের যে কনকলতাকে সে বর্শা আর তলো-য়ারের খেলা শেখাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। শুরু হল নিভৃতে শিক্ষা-দান।

ডানপিটে মেয়ে কনকলতা। সে একটুও ভয় পেল না। তার আগ্রহ দেখে ইমানুয়েলের উৎসাহ গেল বেড়ে। অল্পদিনেই অস্ত্রে নিপুণ করে তুলল

কনকলতাকে।

একদিন একটা পুরনো অশ্বত্থগাছের কাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ইমানুয়েল বলল, ছোঁড় তোমার বর্শা আমার বুক লক্ষ্য করে। দেখি, কেমন শিক্ষা হয়েছে তোমার।

খানিক দূরে বর্শা হাতে দাঁড়িয়েছিল কনকলতা। হাতের বর্শা মাটিতে নামিয়ে সে বলল, অসম্ভব।

ইমানুয়েল হা হা করে হেসে উঠল। বলল, তুমি কি ভেবেছ আমাকে গেঁথে ফেলবে তোমার ঐ বর্শায়? তাহলে ইমানুয়েলের নামে সারা বাংলা দেশটা এমন করে কেঁপে উঠত না। মার, শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে মার। দেখা যাক্ ইমানুয়েল নিজেকে বাঁচাতে পারে কিনা।

কনকলতা বর্শা ছুঁড়ল। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় উড়ন্ত বর্শাটাকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ইমানুয়েল।

হেসে বলল, একটুও জোর নেই বর্শায়। ছোঁড়ার আগে আমার কনকলতার মনটা কাঁপছিল, তাই উড়ন্ত নাগিনীটা ছোবল লাগাতে পারল না। তার আগেই সাপুড়ে তাকে কব্জা করে ফেলল।

গাছের কাছ থেকে সরে গিয়ে বলল, এবার ছোঁড় দেখি বর্শা গাছটা লক্ষ্য করে। দেখি কতখানি জোর তোমার গায়ে। দাঁড়াও, একটা চিহ্ন এঁকে দিই, লক্ষ্যভেদে কতটা দক্ষ হয়েছ তা বোঝা যাবে।

ইমানুয়েল চিহ্নটা এঁকে দিয়ে সরে যেতেই অব্যর্থ লক্ষ্যে সজোরে তাকে বিদ্ধ করল কনকলতা।

গাছের কাণ্ডের সঙ্গে সমকোণ সৃষ্টি করে ভেসে রইল কনকলতার বর্শা।

শাবাশ, বলে করতালি দিয়ে উঠল ইমানুয়েল।

বলল, এ রকম দক্ষতা যদি ছেলেবেলা থেকে আয়ত্ত করতে পারতে তাহলে ইমানুয়েলের হাতে তোমাকে ধরা পড়তে হত না।

কনকলতা এ কথার কোন জবাব না দিয়ে রাগ করে দ্রুত পায়ে ঘরের দিকে চলে গেল।

ইমানুয়েল বর্শাখানা গাছ থেকে সজোরে তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে চলতে লাগল কনকলতাকে অনুসরণ করে।

ইমানুয়েল গ্রীষ্ম আর বর্ষাকালটা কাটাল তার সমুদ্র-ঘেরা মনোরম খাসমহালে। তারপর আকাশ যখন নিবিড় নীল হয়ে উঠল, তুলোর তালের মত ধবধবে সাদা মেঘগুলো যখন ভেসে বেড়াতে লাগল তার বুকে, তখন

ইমানুয়েলের জাহাজে উঠল পাল। তর তর করে এগিয়ে চলল তার জলযান পুরনো শিকারগুলোকে দাস-দাসীর হাটে বেচে দিয়ে নতুন নতুন শিকার ধরতে।

দ্বীপ ছেড়ে আসার আগের দিন রাতে পালঙ্কের ওপর বসেছিল কনকলতা। ইমানুয়েল তার কোষাগারের ডালা খুলে একটি একটি করে বহুমূল্য রত্নে সাজাচ্ছিল কনকলতাকে। সাজানো শেষ হলে বলল, অনেকদিনের সাধ আজ আমার পূর্ণ হল কনক। শুধু হরণ করেছি এতদিন, কিন্তু তার সার্থকতার সন্ধান আজ পেলাম। এসব তোমার। সিন্দুকে বন্দী করে রেখে কি লাভ বল? আমরা যখন জাহাজে ঘুরে বেড়াব তখন প্রতিদিন রাতে তুমি নতুন নতুন অলঙ্কারে সেজে আমার কাছে এসে দাঁড়াবে। আমি তোমাকে দেখব।

ওরা আরও একটি মাস একই সঙ্গে ভেসে বেড়াল। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার দুঃখে ভরে উঠল কনকলতার মন। নির্জন দ্বীপের শান্ত পরিবেশে যে দুঃখকে সে ভুলে গিয়েছিল, তাই আবার বর্ষার মেঘের মত ঘনিয়ে উঠতে লাগল তার মনের ওপর।

কনকলতা ভেবেই পায় না যে মানুষ তাকে ভালবাসার স্বর্গে নিয়ে যায়, সে মানুষটা কেমন করে এমন নৃশংস হতে পারে।

সে জাহাজের ঐ ঘরটা থেকে দেখেছে লুঠতরাজের শেষে ইমানুয়েলকে ঘরে ফিরে আসতে। মানুষটাকে একেবারেই চেনা যায় না তখন। নৌকোর ওপরে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা।

কনকলতার মনে হয়, ঐ মানুষটাকে সে কোনদিন দেখেনি। সুন্দর চেহারার মানুষ মুহূর্তে যে কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তা ইমানুয়েলকে কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যায় না।

একদিন কনকলতা প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। কতকগুলো মানুষকে ধরে আনা হয়েছিল সেদিন। জাহাজের পাটাতনের ওপর তোলা হচ্ছিল তাদের। ওদের ভেতরে একটি বলিষ্ঠ সুন্দর যুবককে দেখতে পেল সে। বেশ অভিজাত কোন ঘরের হতভাগ্য বলেই মনে হল তার।

ওকে যখন নৌকো থেকে ওপরে তুলছিল মগ দস্যুরা, আর খোলা তলোয়ার হাতে তাদের নির্দেশ দিচ্ছিল ইমানুয়েল, তখনই ঘটনাটা ঘটল। যুবকটি জাহাজে উঠতে চায়নি। তার বাঁধন বোধহয় আলগা হয়ে গিয়েছিল, আর ধস্তাধস্তির ফলে একটা আরাকানী মগ পড়ে গিয়েছিল জলে।

চোখের পলকে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। যুবকটির মুণ্ডুটা ছিটকে পড়ল জলে। দুজন মগ দস্যু মুণ্ডহীন দেহটাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রে।

সেদিন বহুক্ষণ মূর্ছাহতের মত পড়েছিল কনকলতা। অনেক রাতে যখন ঘরে এসেছিল ইমানুয়েল তখন তীব্র মাথার যন্ত্রণার ভান করে শয্যার এক-পাশে পড়েছিল সে। সারারাত ইমানুয়েলের সঙ্গে কথা বলেনি, বোধকরি কথা বলার প্রবৃত্তিও সে হারিয়ে ফেলেছিল।

আজকের কথাটা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে কনকলতার। সে এখনও বুঝে উঠতে পারছে না, কেন এতবড় একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে গেল সে। সমুদ্রে সে মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারত আর সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যেত তার সব স্বপ্নের সমাধি। ওরা যখন ক'খানা নৌকো নিয়ে কোন গঞ্জের দিকে চলে গেল তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে রঙের ঢেউ না তুললেও কিছুটা ঢলে পড়েছে। জাহাজটা জলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। ঠিক স্থির না হলেও দুলুনিটা সামান্যই ছিল। ঢেউয়ের জোর ছিল না তেমন।

ক'টা সাদা চামড়ার মানুষ সাজসজ্জা করে হাতে বর্শা আর তলোয়ার নিয়ে গম্ভীর মুখে জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

আরাকানী মেয়েটা ঠিক সেই সময়েই ঢুকল কনকলতার ঘরে।

মেয়েটি কথা বলে কম, কাজ করে নিখুঁত। স্থির শান্ত চোখে সে চেয়ে থাকে, মনে হয় ভেতরের সবকিছু দেখার শক্তি রাখে সে।

কনকলতার মনে হল আজ অসময়ে মেয়েটি ঢুকেছে তার ঘরে।

সে মেয়েটিকে বসতে বলল। মেয়েটি কিন্তু বসল না। শুধু বলল, তুমি কি পেছনের ঐ ঝুল-বারান্দায় একটুখানি যাবে ?

কনকলতা পেছনের দরজা খুলে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। এখান থেকে একখানা সিঁড়ি নেমে গেছে জলের দিকে। বোধহয় সামনের পাটাতনে যুদ্ধ হলে পেছনের গুপ্তপথে নেমে যাবার ব্যবস্থা।

' মেয়েটি বলল, তুমি বড় ভাল, তাই তোমাকে একটা কথা বলব।

কনকলতা বলল, তোমাকেও আমার বড় ভাল লেগেছে। বল ভাই তুমি কি বলতে চাও ?

মেয়েটি বলল, তুমি যদি কথা দাও, কাউকে একথা বলবে না, কেবল তাহলেই তোমাকে আমি একটা কথা বলতে পারি। আর জেনো, কথাটা যদি ফাঁস হয়ে যায় তাহলে আমার মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

কনকলতা বলল, তুমি নির্ভয়ে বল। আমার প্রাণ গেলেও তোমার কথা

আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না।

মেয়েটি সোজা বলল, তুমি কি মা হতে চলেছ? আমার সন্দেহ হচ্ছে তাই জানতে চাইলাম।

কনকলতা বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

মেয়েটির গলায় একটুখানি উদ্বেগের সুর। বলল, একথা কি সর্দার জানে?

না। এখনও বলিনি।

চুপ করে রইল মেয়েটি।

আবার ওকে নীরব থাকতে দেখে কনকলতা বলল, একথা বলছ কেন ভাই?

সময়ে সবই জানতে পারবে।—মেয়েটি চারদিকে চেয়ে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, আর ঐখানেই বিপদ।

কনকলতা অবাক। বলল, বিপদ! কিসের বিপদ?

মেয়েটি বলল, সে কথাটা বলতেই আজ আমার আসা। অবশ্য এর সমাধানের কোন উপায়ই আমার হাতে নেই।

কনকলতা মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মেয়েটি বলল, সর্দার ভোগ করতে জানে, কিন্তু ঝামেলা পোহাতে জানে না। একটু থেমে বলল, আমার আগে আর একটি মেয়ে সর্দারের এই কোঠীর পরিচারিকা হয়ে এসেছিল। একদিন তারও তোমার মত অবস্থা হল। অবশ্য শুনেছি আমাদের আরাকানী এক মাল্লার জন্যেই তাকে ঐ ধরনের অবস্থায় পড়তে হয়েছিল।

এক সময় সর্দারের চোখে পড়ল সব কিছু। মেয়েটিকে ডেকে সর্দার জেনে নিল সব ঘটনা। তারপর ঐ মাল্লাটাকে বর্শা গেঁথে ফেলে দেওয়া হল জলে।

একটা বিস্ময় আর বিভীষিকার আওয়াজ বেরিয়ে এল কনকলতার গলা দিয়ে।

সে বলল, মেয়েটির কি হল?

সর্দার তাকে বলল, তোমাকে বর্শা গেঁথে সাগরে ভাসাব না। তোমার দুটো পা বেঁধে দেওয়া হবে, তবে খোলা থাকবে হাত দুটো। কিছুক্ষণ সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে পারবে।

আরাকানী মেয়েটি নীরব হয়ে গেল। কনকলতা কোন কথা বলতে

পারল না।

কতক্ষণ এমনি কাটল। এক সময় আরাকানী মেয়েটি উঠে চলে গেল।

কনকলতা এ কি শুনল! স্ত্রী হয়ে থাকবে চিরদিন অথচ মায়ের অধিকার পাবে না, এ কেমন কথা!

এক সময় শিউরে উঠল কনকলতা। তারও কি ঐ অসহায় আরাকানী মেয়েটার মত ভয়াবহ মৃত্যু ঘটবে!

ভাবতে ভাবতে কনকলতার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল।

ওদিকে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। অনেক দূরে যে তীরভূমি গাছপালার ক্ষীণ চিহ্ন নিয়ে জেগে ছিল তা একেবারে অস্পষ্ট হয়ে এল।

কনকলতা উঠে দাঁড়াল। না, অনিশ্চিত জীবনের মাঝখানে সে থাকবে না। কোনদিন যদি মিথ্যা বিচারের জন্যে দাঁড়াতে হয় তাকে ইমানুয়েলের মুখোমুখি, তাহলে সে, আর যাই হোক, করজোড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে পারবে না।

কনকলতা সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিলে। পেছনের দরজাটা খুলে বাইরে থেকে আটকে দিলে শেকলটা।

সে তার গর্ভের সন্তানকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে। ঐ আরাকানী মেয়েটির মত দুটো পা বাঁধা অবস্থায় সে অসহায়ের মত মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে যাবে না। শেষ পর্যন্ত তার অনাগত শিশুটির জন্য সে যুদ্ধ করে যাবে সমুদ্রের সঙ্গে।

ঈশ্বরের নাম নিয়ে পেছনের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সে জলের ধারে। একখণ্ড কাঠ বুকে ঠেকিয়ে নিঃশব্দে ভেসে গেল উত্তাল সমুদ্রের বুকে।

সাজাহান দিল্লীর তখ্‌তে বসে বঙ্গোপসাগর তোলপাড়কারী মগ আর ফিরিঙ্গীদের শায়েস্তা করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি ফিরিঙ্গী আর মগেদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বিশেষভাবে জানতেন। গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নরহত্যা, নারীপুরুষ হরণ করে তারা একসময় নিম্নবঙ্গকে বিভীষিকার দেশে পরিণত করেছিল। বঙ্গোপসাগরের তীরে অনেক সমৃদ্ধ জনপদ তাদের অত্যাচারে প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। হিজলীর কাছে ভাগীরথীর মোহনার নাম ছিল 'দস্যু নদী'।

হুগলী নদী যেখানে এসে বঙ্গোপসাগরে তার ধারা মিলিয়েছে সেখানেই হিজলীর অবস্থান। তাই সাজাহান বঙ্গোপসাগরের উপকূলের এই স্থানটি

বেছে নিলেন তার ফৌজদারী প্রতিষ্ঠার জন্য। তৈরী হল 'নওয়ার মহল'। এখানে 'নৌয়ারা' বা নৌসেনারা থাকত। তারা দরকার হলে ফৌজদারের আদেশে লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকত।

এক সময় হিজলীর ফৌজদার খবরাখবর সংগ্রহের জন্য সরবোলা নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করে। তারা সমুদ্রতীরে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। দূর থেকে দস্যুদের জাহাজের কোন সন্ধান পেলে ফৌজদারীতে এসে খবর দিত তখন ফৌজদারের সৈন্যেরা তৈরী হত যুদ্ধের জন্যে। এ ছিল যাত্রী-দের নৌকাগুলোকে নিরাপদে যাতায়াতের সুবিধা করে দেবার জন্যে বাদ-শাহী ব্যবস্থা।

ঐ সরবোলারাই চিরকালের প্রবাদ-বাক্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রক্ষক থেকে ভক্ষক হয়ে গেল। তারা ভুল সংকেত দিয়ে নির্জন কোন স্থানে নিয়ে যেত যাত্রী-নৌকো। তারপর সুযোগ বুঝে দস্যুদের সঙ্গে সহযোগিতা করে হরণ করত যাত্রীদের বিত্ত। একথা চাপা রইল না। তখন বন্ধ হয়ে গেল তাদের বৃত্তি। লোপ পেল সরবোলাদের পদ। তারা কেউ বা চাষ-আবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ল, কেউ বা ভিড়ল ঠ্যাঙাড়েদের দলে।

হিজলীর সরবোলাদের ভেতরে মথুরানাথ নামে একটি অতি সৎ লোক ছিল। সহকর্মীদের নোংরা কাজের জন্য ধিক্কার দিত। অসহায় যাত্রীদের সাহায্য করত সাধ্যমত। একটি বিশাল বটগাছের ওপর উঠে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সে শত্রু-নৌকোর গতিবিধি লক্ষ্য করত। যথাসময়ে সংবাদ দিত ফৌজদারীতে।

সরবোলা পদটি উঠে যাওয়ায় দরিদ্র মথুরানাথের চাকরীটিও চলে গেল। কিন্তু মথুরানাথ সে অঞ্চল ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে গেল না। জনমানবহীন সমুদ্রতীরবর্তী স্থানটিতে সেই বিশাল বটগাছের ছায়াশীতল কোলে একটি ছোট্ট ঘর তৈরী করে সে থেকে গেল।

মথুরানাথ নিঃসঙ্গ ছিল। নিকট কোন আত্মীয়স্বজন তার ছিল না। তাই দূর জনপদে তার ঘন ঘন যাবার কোন প্রশ্নই উঠত না। সে যখন বলিষ্ঠ শক্তিমান যুবাপুরুষ ছিল তখন গ্রামের পাশের ফৌজদারীতে নানারকম অস্ত্রযুদ্ধের কৌশল শিখেছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তাই পরবর্তীকালে সরবোলা পদ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কসবা হিজলীর ফৌজদার তাকে ঐ পদে বহাল করেছিল।

দশ বছর ঐ পদে কাজ করে যখন তার চাকরী গেল তখনও সরকারের

ফৌজদারীর সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল না। সে সমুদ্রতীরে কোন দুঃসংবাদের গন্ধ পেলেই ছুটে যেত ফৌজদারীতে। খবর দিয়ে সজাগ করে দিয়ে আসত বাদশাহী নৌয়ারদের।

মথুরানাথের বয়স এখন পয়তাল্লিশের কাছাকাছি। প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠার আগে সে বনের ভেতর দিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে হাঁটতে থাকে। সমুদ্রের জল ছুঁয়ে ভোরের বাতাস বয়ে আসে। গাছের পাতায় শব্দ হয়। মথুরানাথ পা চালিয়ে বেরিয়ে আসে বন থেকে। প্রথম সূর্যের মুখ দেখে সে রোজ সকালে। প্রণাম করে দুটি হাত জোড করে।

রোজকার মত সেদিনও মথুরানাথ সমুদ্রতীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সূর্য ওঠার সময় হয়নি তখনও। সে চেয়ে ছিল সমুদ্রের দিকে। ঢেউগুলো একটার পর একটা এসে আছড়ে পডছে বালুতীরে।

হঠাৎ ঢেউয়ের দিকে তাকাতে তাকাতে তার চোখে পডল, কে যেন উঁচু বালির ঢিবিটার কাছে পডে আছে। ঢেউগুলো আলতো ভাবে তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মথুরানাথ দ্রুতপায়ে সেখানে এগিয়ে গেল।

একি! এ যে একটি মেয়ে! বোধহয় কোন নৌকাডুবির ফলে হত-ভাগ্য মেয়েটি এখানে এসে ঠেকেছে।

মথুরানাথ হাঁটু গেডে বসে মেয়েটির দেহে প্রাণ আছে কিনা পরীক্ষা করতে লাগল।

কনকলতার জ্ঞান ছিল, কিন্তু দেহে ছিল না একফোঁটা শক্তি। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে সে তার শেষ শক্তিটুকুকে একেবারে ফুরিয়ে ফেলেছিল। এলোমেলো বেশবাস ঠিক করে নেবার মত সামর্থ্য ছিল না তার। সে অসহায়ের মত চোখ মেলে চেয়ে দেখল, তার মুখের ওপর ঝুঁকে বসে আছে একটি পুরুষ মানুষ। মথুরানাথ কনকলতাকে চোখ মেলতে দেখে আশ্বস্ত হল। তাহলে মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে।

মথুরানাথ কনকলতাকে উঠে বসতে সাহায্য করল। কনকলতার দেহের অলঙ্কারগুলোর ওপর এসে পডেছিল প্রথম সূর্যের আলো। মথুরানাথের চোখ সেইসব অলঙ্কারের দ্যুতিতে ধাঁধিয়ে গেল। দেহের গঠন আর আভরণ দেখে তার মনে হল, মেয়েটি সামান্য ঘরের নয়।

এবার কনকলতাকে সে তার বলিষ্ঠ দুটো বাহুতে তুলে নিয়ে এল তার কুঁডে-ঘরে। মেয়েটির একা একা বসে থাকার সামর্থ্যও ছিল না তখন।

সারাদিন পরিচর্যা আর পথ্যের ফলে কনকলতা শেষবেলায় নিজে নিজেই

বিছানার ওপর উঠে বসতে পারল। সে এখন অনেক সুস্থবোধ করছে।

মথুরানাথ বলল, আমি এখানে একলা এই নির্জন জায়গায় থাকি। তোমার হয়তো অসুবিধে হতে পারে। আজ রাতটা কোনরকমে এখানে কাটিয়ে দাও, কাল তোমাকে লোকালয়ে নিয়ে যাব। সেখান থেকে তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।

কনকলতা বলল, আমার কোন ঘর নেই দাদা।

দাদা ডাক শুনে মথুরানাথের মনটা ভরে গেল। সে বলল, তুমি আমার মেয়ের মত। তবু যে নামে ডাকলে খুশি হও সেই নামেই ডেকো। কিন্তু তোমার ঘর নেই বলছ কেন দিদি? তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি অনেক বড ঘরের মেয়ে।

কনকলতা বলল, সে অনেক দুঃখের কাহিনী দাদা। আমার মত দুঃখিনী মেয়ের সমাজে কোন পরিচয় বা স্থান নেই।

একে একে কনকলতা মথুরানাথের কাছে তার জীবনের বৃত্তান্ত বলে গেল। তার দিকে চেয়ে কনকলতা বুঝতে পেরেছিল, এ মানুষের কাছ থেকে তার কোন ভয় নেই। আশ্চর্য এক পবিত্রতার আলো ফুটে উঠেছিল মথুরানাথের মুখে। নিজের কাছে তার সন্তান-সম্ভাবনার কথাটুকু বলতেও সংকোচ করল না সে।

মথুরানাথ সব শুনে বলল, ঠিক করেছিস দিদি। ছেলেপুলে হল ভগবানের দান। সে দানকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করতে হয়। আর শিশুর ত কোন জাত নেই দিদি। মানুষের পরিচয় তার কাজে, জন্মে নয়। তুই আমার কাছে থাক, কোন ভাবনা নেই তোর। ভাই-বোনে কেটে যাবে দিন।

দিনগুলো সত্যিই কেটে যেতে লাগল পরম আনন্দে। জীবনে বোনের স্নেহ, মা-বাপের আদর পায়নি কোনদিন মথুরানাথ। ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই হারিয়েছিল মা-বাবাকে। ভাই-বোন তো ছিলই না তার। এখন মথুরানাথের মনে হল, সে যেন জীবনের একটা অজানা অর্থ আবিষ্কার করে ফেলেছে।

কনকলতার বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়ে সারাদিন খেলায় মেতে থাকে মথুরানাথ। ঠিক যেন দেবদূতের মত দেখতে হয়েছে ছেলেটিকে। মথুরানাথের অগাধ স্নেহ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উচ্ছ্বসিত আবেগে আছড়ে পড়ে ছেলেটির ওপর।

কনকলতা বিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, তুমি আমাকে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়েছ প্রভু।

ছেলের নাম রাখা হল অনিরুদ্ধ। মাতুল মথুরানাথ। পিতা পরিব্রাজক, সংসার-ত্যাগী। তাই মাতুলের আশ্রয়ে অনিরুদ্ধের দিনযাপন।

ধীরে ধীরে বড হতে থাকে অনিরুদ্ধ। মায়ের অনুকরণে সে-ও মথুরানাথকে ডাকে দাদা বলে। খুশী হয় মথুরানাথ।

কনকলতা ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। অবিকল পিতার আকৃতি নিয়ে বেড়ে উঠছে ছেলে। চোখের তারায় সাগরের নীল। চুলে শেষ-সূর্যের সোনা।

দশ বছরের ছেলের দেহের আকৃতি দেখে সবাই বিস্মিত হয়। মথুরানাথ দূর গাঁয়ের পাঠশালা থেকে অনিরুদ্ধকে নিয়ে যায় সংস্কৃত টোলে। আরও দশটি বছর সংস্কৃত শিখে দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে অনিরুদ্ধ। এরপর অনিরুদ্ধের শেষ শিক্ষা মৌলভীর কাছে ফার্সী।

এদিকে রোজই গৃহে চলতে থাকে শক্তি-চর্চা। ছেলেবেলা থেকেই কনকলতার কাছে তার অস্ত্র-শিক্ষার হাতে-খড়ি।

প্রতিদিন অনিরুদ্ধ মায়ের কাছে শুনত ফিরিঙ্গী আর মগ দস্যুদের লুণ্ঠনের কাহিনী। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী জনপদের মহাশ্মশানে পরিণত হবার কথা।

গল্প শুনতে শুনতে অন্যান্য ছেলেদের মত ভীত হত না অনিরুদ্ধ। জ্বলে উঠত তার চোখ। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠত।

অনিরুদ্ধ আচমকা প্রশ্ন করত, ফিরিঙ্গীদের জাহাজে কত দস্যু থাকে মা?

কনকলতা একটু ভেবে জবাব দিত, তা পঞ্চাশ-ষাট জন তো হবেই।

অবাক চোখে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ বলত, বাস্! ঐ পঞ্চাশ জন মানুষ আমার দেশের হাজার মানুষকে হটিয়ে দিচ্ছে?

কনকলতা চুপ করে থাকে কতক্ষণ। একসময় বলে, আমার দেশের মানুষ শান্তি চেয়ে এসেছে চিরদিন, তাই লড়াইকে তারা এড়িয়ে চলে বাবা।

অনিরুদ্ধ বলে, ঠিক দেখো মা, আমি একদিন ওদের মুখোমুখি লড়াই করব।

কনকলতা শিউরে উঠে বলে, একা একা কি লড়াই করতে কেউ যায় বাবা?

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ জবাব দেয়, সবাই মিলে লড়াই করে ওদের হটাব। এর জন্যে দল গড়ে তুলতে হবে।

সত্যিই একদিন দল গড়ে তোলে অনিরুদ্ধ। নিজের প্রবল শক্তি আর দক্ষতা দেখিয়ে সে তখন কসবা হিজলীর ফৌজদারের পদে উন্নীত হয়েছে। নওয়ার মহালকে ঢেলে সেজে গড়ে তুলছে সে।

কিন্তু শুধু মাস-মাহিনাতে যারা কাজ করে তারা সুযোগ খুঁজবে লড়াইয়ের সময়ে আত্মরক্ষার। দেশকে, দেশের মানুষকে, নিজের ঘর, নিজের মানুষ বলে ভাবতে না পারলে কোন লড়াই-ই জেতা যায় না, যাবে না।

অনিরুদ্ধ প্রতিদিন তার সাদা ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে যায়। এক একদিন এক একটি জনপদের সামনে গিয়ে সে দাঁড়ায়। তার বলিষ্ঠ সুন্দর দেহখানা দেখে সবাই আকৃষ্ট হয়। সে কথা বলে হিন্দু-মুসলমান সকলের শাস্ত্র থেকেই আশ্চর্য লাগসই সব উদাহরণ খুঁজে নিয়ে। শক্তির সঙ্গে বিদ্যার এমন যোগ দেখে বিস্মিত হয় মানুষজন। তারা চুম্বকের মত আকৃষ্ট হয় অনিরুদ্ধের ডাকে।

অনিরুদ্ধ বলে, ফৌজদার কখনো তার সৈন্য নিয়ে দেশ-রক্ষা করতে পারে না, দেশের মানুষকেই করতে হয় দেশ-রক্ষা। ফৌজদারের সৈন্যরা তাদের পরিচালনা করে, জয়ের পথ দেখায়।

আপনারা চলুন সমুদ্রতীরে। বিস্তীর্ণ পতিত প্রান্তরে গড়ে তুলুন নয়া বসত। লক্ষ্মীর দানে ভরে তুলুন আপনাদের ভাণ্ডার। অপহরণকারী এলে সবাই মিলে তাদের অপরাধের দিন চরম শাস্তি। ফৌজদারের যোদ্ধারা জানবেন সব সময় আপনাদের পাশে পাশে ছায়ার মত থাকবে। না ডাকতেই তারা হবে আপনাদের দুর্দিনের সঙ্গী।'

দিনে দিনে ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে নদী যেমন করে গ্রাস করে নেয় নগর জনপদ, ঠিক তেমনি দস্যুভয়ে পরিত্যক্ত প্রান্তরে ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়তে লাগল মানুষজন। যারা দরিদ্র অথচ সাহসী তারাই এগিয়ে এল সবার আগে।

নিম্নবঙ্গের মানুষ জেগে উঠেছে। ক্ষীণ হয়ে এসেছে মগ আর ফিরিঙ্গী দস্যুদের শক্তি। তাদের একটির পর একটি দুর্গ বিধ্বস্ত করে দেওয়া হচ্ছে। হুগলী আর হিজলীর কুঠী ছেড়ে পালিয়েছে তারা। চাটগাঁ, সন্দ্বীপ, দক্ষিণ সাহাবাজপুরের দুর্গ থেকেও তারা বিতাড়িত।

শুধু একটি ঈগলকে আকস্মিক ভাবে দেখা যায় উড়ে আসতে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অসীম তার ডানার জোর। সে হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের ওপর। কঠিন চঞ্চুতে বিদ্ধ করে নিয়ে চলে যায় তার শিকার।

এত ক্ষিপ্র তার গতি, এমন অব্যর্থ তার লক্ষ্য, আর এমন বিদ্যুৎ-চকিত তার প্রস্থান যে সে রয়ে গেল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। শুধু লোক মুখে ছড়ায় তার কথা। সে নাকি বহুরূপী। কখনো ধীবরের বেশ ধরে, কখনো সজ্জিত বরের পোশাকে সঙ্গীদের সঙ্গে তার আগমন। মানুষের সতর্ক হবার আগেই লুণ্ঠন ও হত্যা কাণ্ড শেষ করে প্রস্থান।

তার জাহাজখানার রঙও নাকি প্রয়োজন মত বদলে যায়। শরতের আকাশ ভরে যখন সাদা মেঘের আনাগোনা চলে তখন তার জাহাজের সব ক'টি পালই ধবধবে সাদা। আবার শেষবেলা কোন আক্রমণের জন্য সে যখন গঞ্জের দিকে এগোতে থাকে তখন তার জাহাজের পালগুলোর রঙ হয় রক্তিম গৈরিক। রাতের বেলা আবছা জ্যোৎস্নায় তার জাহাজের পালগুলো ধূসর রঙে রাঙানো থাকে। দূর থেকে দেখলে চেনা যায় না।

ক'দিন ঘুম নেই ফৌজদার অনিরুদ্ধের চোখে। খবর এসেছে তার কাছে হুগলীর মোহনার অদূরে দেখা গেছে সেই মায়াবী জাহাজটাকে।

এক ধীবর স্রোতের টানে গিয়ে পড়েছিল সমুদ্রে। সে তার একার শক্তিতে ফেরাবার চেষ্টা করেও ফেরাতে পারেনি তার ছোট্ট ডিঙিখানা। সন্ধ্যার মুখে সে যখন বাহির সমুদ্র থেকে অনুকূল স্রোতে ফিরে আসছিল তখনই নদী-মোহনার মুখে দেখতে পেয়েছিল একটি জাহাজ। অন্ধকারের সঙ্গে মিশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নোঙর ফেলে।

দিনে বহু চেষ্টা করেও সন্ধান পাওয়া যায়নি তার। কিন্তু রাতে সংগোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে।

অনিরুদ্ধ স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছে, এ সেই মায়াবী জাহাজ। জনপদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ সন্ধান করছে।

ধীবরটিকে তার খবরের জন্য পুরস্কৃত করেছে অনিরুদ্ধ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কঠিন ভাবে বারণ করে দিয়েছে খবরটি রটনা না করার জন্য। সে জানে সব রোগের চিকিৎসা আছে, কিন্তু ত্রাস নামক রোগের কোন চিকিৎসা নেই।

সমুদ্রতীরবর্তী ফৌজদারীতে একটা উৎসবের আয়োজন করল অনিরুদ্ধ। অতি অকিঞ্চনের ঘরের একটি মেয়েকে সে বিয়ে করবে, তারই আয়োজন।

কনকলতা আর মথুরানাথ কত বুঝিয়েছে তাকে বিয়ের জন্য, কিন্তু জন-সংগঠনের কাজে ব্যস্ত থাকায় সে বলেছে, সময় কই আমার বিয়ের। কখনো বা বলেছে, সংসারী হওয়া আমার কর্ম নয়। বাবার মত একদিন হয়তো বা, পরিব্রাজক হয়েই বেরিয়ে যাব।

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল কনকলতা। কিন্তু আজ ছেলের নতুন অভিপ্রায়ে মনের খুশী উপচে পড়ল বাইরে। যে সাধ তার অপূর্ণ থেকে গেছে, সন্তান আর বধূর ভেতর সে দেখবে তার পূর্ণতা।

বিয়ে হয়ে যাবার পর নববধূ এসেছে ঘরে, তাই আজ উৎসব। সকাল থেকে বহু জনসমাগম হয়েছে। ভূরি-ভোজে আপ্যায়িত হয়েছে সকলে। রাতে রোশনাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনিরুদ্ধ অনুমান করেছে, রোশনাইয়ের আলো প্রলুব্ধ করবে ফিরিঙ্গী দস্যুকে, সে তৈরী হবে আক্রমণের জন্য। কিন্তু সে জানে ফৌজদারের ঘাঁটি বেশী দূর নয়। তাই সে আলো-ঝলমল রাতে আসবে না। যখন সব আলো নিভে যাবে তখনই নিঃশব্দে সে লুণ্ঠনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে।

অনিরুদ্ধ জানে বহুদূর থেকে দেখা যায় তার গৃহশীর্ষ। আর ঐ শীর্ষই জলদস্যুকে করেছে প্রলুব্ধ।

অনিরুদ্ধ প্রস্তুত।

অনিরুদ্ধ বনের আড়ালে প্রস্তুত করে রাখল তার বাহিনী। নির্দেশ দিয়ে গেল নিঃশব্দে থাকবে সকলে। নৌকোগুলো যখন কূলের কাছাকাছি আসবে তখন হঠাৎ মশালে আগুন ধরিয়ে ছুটবে ওদের দিকে। আচমকা আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে পালাবে ওরা। বহুদূর অবধি মশালধারীরা যেন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন ওরা বুঝতে পারে বহু সংখ্যক যোদ্ধা ওদের ঘিরে ফেলেছে।

এদিকে রোশনাইয়ের আলো ধীরে ধীরে নিভে আসতে লাগল। অনিরুদ্ধ প্রায় বিশ খানা নৌকায় শতাধিক শক্তিশালী যোদ্ধা নিয়ে কাউখালির নদী ধরে অন্ধকারে এগিয়ে যেতে লাগল। নির্ভুল খবর ছিল তার কাছে, প্রায় দুই ক্রোশের মধ্যে হিজলীর ফৌজদারীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজখানা।

খানিক পথ গিয়েই অনুমানে বোঝা গেল জাহাজটার অস্তিত্ব।

অন্ধকার রাত্রি, কেউ কাউকে দেখল না। অনিরুদ্ধ তার নৌ-বাহিনী,

নিয়ে চলে গেল জাহাজ ছাড়িয়ে আরও দূরে।

অনেকটা সময় কেটে যাবার পর যখন সমুদ্রতীর থেকে শোনা গেল কোলাহল, আর জলে উঠল সারি সারি মশাল, তখন অনিরুদ্ধ তার বাহিনীকে জাহাজের দিকে দ্রুত নৌকোগুলো বেয়ে নিয়ে যেতে বলল। জলদস্যুদের নৌকোগুলো তাড়া খেয়ে ফিরে আসার আগেই জাহাজে উঠতে চায় অনিরুদ্ধ।

তাই হল। বিশ খানা নৌকো এসে ভিড়ল জাহাজের গায়ে। মুষ্টিমেয় ক'জন জাহাজের রক্ষী অন্ধকারে তাদের চিনতে পারল না। বিনা বাধায় তারা উঠে এল ওপরে। ক'টি নিরীহ রক্ষী বন্দী হল সহজেই।

এখন ফিরে এল দস্যুদের নৌকো। অনিরুদ্ধর নৌকোগুলো জাহাজের বিপরীত দিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ওরা টের পেল না নতুন অতিথির।

ওরা উঠে এল ওপরে। লড়াই প্রায় এক তরফাই হল। কয়েকটা মগের মুণ্ডু ছিটকে পড়ল জলে। অধিকাংশই বন্দী হল অনিরুদ্ধের লোকেদের হাতে।

প্রবল বিক্রমে ইমানুয়েল কোষ থেকে মুক্ত করতে গেল তার তলোয়ার, কিন্তু বের করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবলতর আঘাতে কে যেন বহু দূরে ছিটকে ফেলে দিল তার তরবারীখানা।

বিস্মিত ইমানুয়েলের হাত কাঁপতে লাগল। জীবনে এই প্রথম বুঝি তার হাত থেকে খসে পড়ল অস্ত্র।

ইমানুয়েল তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিল না। হা হা করে হেসে উঠে বলল, শাবাশ! শাবাশ!

জাহাজটাকে একেবারে কূলের কাছাকাছি টেনে আনা হয়েছে। বন্দীদের রাখা হয়েছে তার ভেতর। কেবল দস্যু-দলপতি ইমানুয়েলকে নিয়ে আসা হয়েছে অনিরুদ্ধের বাসগৃহে। সেখানে একটি সুরক্ষিত কক্ষে তাকে রাখা হয়েছে বন্দী রূপে। আগামী কাল প্রকাশ্যে হবে তার বিচার।

রাত তখন গভীর। সমস্ত অট্টালিকা সুপ্তিমগ্ন। অমাবস্যার নিরন্ধ্র অন্ধকার গ্রাস করে রেখেছে চরাচর। হঠাৎ ইমানুয়েল মেঝের ওপর চমকে উঠে দাঁড়াল। একটা দরজা খোলার শব্দ হয়েছে। অন্ধকারে কিছু অনুমান করতে পারল না সে।

চকমকি ঠোকার শব্দ হল। ক্ষীণ একটা প্রদীপের আলো জ্বলে উঠেছে।

ঘরের অন্ধকার সরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কোণে।

দীপ হাতে এগিয়ে আসছে একটি নারীমূর্তি। কাঁপছে আলো, কাঁপছে ছায়া।

কাছে এসে মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়াল। দীপটা তুলে ধরে বলল, চিনতে পার আমাকে?

ইমানুয়েল কতক্ষণ চেয়ে রইল ঐ মুখের দিকে। এক সময় আবেগে উঠে দাঁড়িয়ে স্পর্শ করল মুখখানা, কনকলতা, আমার কনকলতা।

কনকলতার হাত থেকে দীপটা মেঝেতে পড়ে নিভে গেল। সে বাঁধা পড়ল দস্যু ইমানুয়েলের বাহুর বাঁধনে।

কনকলতা কি কাঁদছিল? না পাষাণ হয়ে গিয়েছিল তার বুক ভাগ্যের পরিহাস দেখে?

এক সময় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে মনে শক্তি এনে বলল কনকলতা, আমি এসেছি তোমাকে মুক্তি দিতে, এখুনি পালাও।

ইমানুয়েল বলল, কিন্তু আমি তো একা চলে যেতে পারব না কনক। আমার সঙ্গীরা দীর্ঘজীবন আমাকে সঙ্গ দিয়েছে, তাদের ছেড়ে একা চোরের মত আমি পালাব কোথায়?

কনকলতা যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে বলল, তুমি কি চাও সন্তান দেবে তার পিতার চরম দণ্ড?

কে আমার সন্তান কনকলতা?—প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল দস্যু ইমানুয়েলের গলা।

আস্তে, এখুনি জেগে উঠবে সবাই। জানাজানি হয়ে যাবে সব কথা। হ্যাঁ, ঐ তোমার সন্তান, যে তোমাকে নিয়ে এসেছে বন্দী করে। সে জানে না যে সে কাকে ধরে এনেছে।

আমার সন্তান!

হ্যাঁ, তোমার সন্তান। আমি তাকে দেহে ধারণ করে তোমার ক্রোধ থেকে রক্ষা করব বলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।

ইমানুয়েল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার বুকে মাথায় আছড়ে পড়তে লাগল মহাসাগরের ঢেউ।

একসময় অন্ধকারের ভেতর উচ্চারিত হল একটি কথা, আমি ওর পিতা নই কনক। মুহূর্তের তীব্র উত্তেজনায় ওর জন্ম। তারপর কোন দায়ই ছিল না আমার। তুমি তাকে রক্ষা করেছ, তুমি তার পিতা, তুমি তার

মাতা।

না, না, এমন করে তুমি কথা বোল না। এ হয় না, এ হয় না। তুমি জান না কি ভীষণ শাস্তি অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।

অন্ধকারে একটা পরিতৃপ্তির হাসি হাসল ইমানুয়েল।

বলল, কাল প্রকাশ্য স্থানে অগণিত জনতার মাঝখানে পারবে কনকলতা ঐ সুন্দর বলিষ্ঠ যুবককে আমার পুত্র বলে পরিচয় দিতে?

নীরব হয়ে রইল কনকলতা।

ইমানুয়েল বলল, তা তুমি পার না। একজন অভিশপ্ত খুনীর পুত্র বলে পরিচয় দেওয়া সহজ নয় কনকলতা, আর সম্ভবও নয়।

ইমানুয়েল একটু থেমে আবার বলল, তার চেয়ে যেমন অপরিচয়ের অন্ধকারে ছিলাম তেমনি থেকে যাই। বিচার হোক। পুত্রের হাতে পিতার নয়, এক শক্তিমান দেশভক্ত যুবকের হাতে এক ঘৃণ্য খুনীর বিচার।

হঠাৎ অন্ধকারে কনকলতাকে জড়িয়ে ধরল ইমানুয়েল। গলা তার কাঁপছে। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও কনকলতা। এতবড় সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত কোর না। তোমার দেশের কাছে এতদিন যে ঋণ করেছি তারই শোধ দিয়ে যাব আমার সন্তানের—না, না, আমার নয়, তোমার সন্তানের কাছে কনকলতা। তুমি দয়া কর, দয়া কর এ দস্যুকে।

ঘর থেকে রুদ্ধ আবেগটুকু বুকে চেপে ছুটে বেরিয়ে এল কনকলতা। সে অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে আঘাত খেতে খেতে একসময় বেরিয়ে এসে আছড়ে পড়ল সমুদ্রের বেলাভূমিতে। হাহাকার করে বুক ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। আছড়ে পড়া ঢেউয়ের গর্জনে কনকলতার সে হাহাকার অন্য কারো কানে গিয়ে বাজল না।

থামল সাগর। সমুদ্রের জলে তখন সন্ধ্যা নেমে এসে নীল জলরাশিকে উত্তাল কালো করে তুলেছে।

অ্যানি বলল, দারুণ কাহিনী। কিন্তু বিচারে ওদের কি হল সাগর।

মৃত্যুদণ্ড। তবে কোন অস্ত্রাঘাতে, শূলদণ্ডে কিংবা ফাঁসির দড়িতে নয়।

তবে?

দীর্ঘদিন সমুদ্র যাদের সাম্রাজ্য ছিল, সেই সাম্রাজ্যেই তাদের সমাধি দেওয়া হয়েছিল। হাল ভেঙে, পাল ছিঁড়ে জাহাজখানাকে সমুদ্রে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নৌয়ারার দল। ঐ জাহাজের খোলেই বন্দী করে রাখা হয়েছিল ফিরিঙ্গী আর মগ দস্যুদের। ঠিক যেমনটি তারা বন্দী করে রাখত

দাসদাসীদের। অনির্দিষ্ট ভাগ্যের হাতে বন্দী অবস্থায় তারা ভাসতে লাগল। সে সময় সন্ধ্যার দিকে সমুদ্রের বুকে ঝড় শুরু হত। পরের দিন নৌয়ারার দল নদী সমুদ্র চুঁড়েও ইমানুয়েলের জাহাজের সন্ধান পেল না। কয়েক দিন পরে ভাঙা মাস্তুলের টুকরো আর কিছু কাঠ সমুদ্রতীরে পাওয়া গেল।

অ্যানি বলল, পরিণতিটা সত্যিই ভয়ানক।

গাছতলা থেকে ওঠার আগেই চাঁদ উঠল। একদল মলঙ্গী মেয়ে পুরুষ ঝুড়ি আর কোদাল কাঁধে নিয়ে চলেছে গাঁয়ের দিকে।

অ্যানি চুপি চুপি বলল, এরা কারা সাগর?

মলঙ্গী। খালাড়ী থেকে কাজ করে ফিরছে।

খালাড়ীতে শুনেছি নুন তৈরি হয়। মলঙ্গীদের কাজ কি?

সাগর বলল, ঐ সব খালাড়ীতে কার্তিক মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত নুন তৈরির কাজ করে মলঙ্গীরা। তারপর আষাঢ় মাসে চাষের কাজ করে জমিদারের জমিতে। বর্ষাকালে যে সব জমি জোয়ারের লোনা জলে ধুয়ে যায় ঐ সব জমিতেই নুন তৈরি হয়। ঐ জমিগুলোকে বলে চর। এক একটা চরে অনেকগুলো করে খালাড়ী থাকে। প্রত্যেকটা খালাড়ীতে সাতজন করে মলঙ্গী কাজ করে। নুন-মাটি থেকে ওরা এক ধরণের বিশেষ পদ্ধতিতে নুনজল বের করে নেয়। ঐ জলে জ্বালন দিলে জল শুকিয়ে গিয়ে তলায় নুনটা পড়ে থাকে।

অ্যানি জানতে চাইল, এক একটা খালাড়ীতে কতখানি নুন তৈরি হয়?

প্রায় দুশো থেকে আড়াইশো মণ।

এখন তো সব খালাড়ী কোম্পানির হাতে। হিজলীর সল্ট এজেন্টের হাতে লবণ তৈরির ব্যবস্থা থেকে ফৌজদারীর বিচার পর্যন্ত সব ক্ষমতা দেওয়া আছে। ভদ্রলোক বেশ কয়েক বছর কাজ করছেন। খুবই সৎ আর যোগ্য।

সাগর বলল, তুমি ওঁকে জানলে কি করে?

অ্যানি বলল, সেদিন যে ওঁর ওখানে আমি আর দাদা পার্টিতে গেলাম। বলতে বলতে হঠাৎ অ্যানি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল—জানো সাগর, তোমাকে সেদিনকার পার্টির কথাটা বলা হয়নি। এ দেশীয় একটি মানুষকে দেখে আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।

কি রকম?

মানুষটি নদীর ওপার থেকে এসেছিলেন। চেয়ে দেখবার মত। খুবই

সম্ভ্রান্ত জমিদারের চেহারা। নদীর ওপারে চব্বিশ পরগণার সল্ট এজেন্ট মিঃ প্লাউডেনের সঙ্গে এসেছিলেন। মিঃ প্লাউডেনেরই দেওয়ান উনি।

তোমার সঙ্গে আলাপ হল?

মিঃ প্লাউডেনই আলাপ করিয়ে দিল। ওঁর নাম দ্বারকানাথ টেগোর।

সাগর বলল, এ নাম বার বার উচ্চারণ করতে হয়।

কেন সাগর? তুমি তো মানুষটিকে দেখনি, তাহলে শুধু নামটা এত ভাল লেগে গেল কেন?

যিনি আমার ইষ্টদেবতা, যিনি আমার প্রভু, তাঁর একটি নাম দ্বারকানাথ।

তাই বুঝি?

আমি যে কৃষ্ণের নামগান করি তিনিই দ্বারকানাথ।

অ্যানি বলল, কৃষ্ণকে তোমরা ভগবান বলে পূজা কর?

শুধু তাই নয় অ্যান, প্রেমিক পুরুষকে তার প্রেমিকা যেমন ভালবাসে কৃষ্ণকে আমরা তেমনি ভালবাসি।

ভালবাস!

হ্যাঁ অ্যানি, আমরা তাঁকে আমাদের ভালবাসার মানুষ বলে মনে করি।

এরপর পথ চলতে চলতেই তন্ময় সাগর কৃষ্ণ আর রাধার ভালবাসার কাহিনী অ্যানিকে শোনাতে লাগল। যত কথা সে জানত সব উজাড় করে বলে গেল।

অ্যানি এক সময় বলল, দ্বারকানাথ টেগোরকে দেখে আমার ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করছিল। উনি যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন ওঁর চোখ আর ঠোঁট আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। যে কোন মেয়ে ওঁকে দেখলেই ভালবাসবে। তোমাদের কৃষ্ণকে যেমন সবাই ভালবাসতে চায়।

সাগর বলল, বাসবেই তো। আমার প্রভুর নামের ছোঁয়া যেখানে সেখানে যে ভালবাসার সাগর উথলে ওঠে।

লাইটহাউসে ঢোকার আগে অ্যানি বলল, তোমার বাবার সঙ্গে একদিন তোমাকে গুন গুন করে কি যেন গাইতে শুনেছিলাম। তুমি কি কৃষ্ণের গান গাইছিলে?

ঐ গানই তো আমরা গাই। এখানে আসার আগে আমি আর আমার বাবা রাধাকৃষ্ণের নামগান আর পালাগান গেয়ে বেড়াতাম।

পালাগান কি?

রাধাকৃষ্ণর প্রথম দেখা, ভালবাসা, মান অভিমান, বিরহ বিলাপের যে সব গল্প একটু আগে তোমাকে শোনালাম, তারই এক একটি ছোট ছোট কাহিনী নিয়ে পালা তৈরি হয়। গানের ভেতর দিয়ে রাধাকৃষ্ণর ঐ কাহিনী-গুলো আমরা বলে যাই।

আমাকে একদিন তোমার ঐ পালাগান শোনাবে?

ওটি পারব না অ্যানি।

কেন পারবে না সাগর?

সাহেব রাগ করবেন। দয়া করে সাহেব এ গরীবকে তোমার কাছে থাকবার সুযোগ দিয়েছেন। গান শুনে বিরক্ত হলে আমার মাথা গোঁজার জায়গাটুকুও থাকবে না।

অ্যানি ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বলল, না না, এ্যাডাম ও রকম নয়। তুমি ওর সবন্ধে ভুল ধারণা করেছ সাগর। তোমাকে ও খুব ভাল নজরে দেখে। তোমার চেহারার কথা, তোমার ব্যবহারের কথা ও অনেক বড করে বলে।

এ্যাডাম তার বোন অ্যানির কাছে সাগরকে নিয়ে আলোচনা করেছে জেনে সাগর ভারী লজ্জা পেল। সে বলল, তোমার ঘরে একদিন তোমাকে আমি গান শোনাব। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গান গাইব। তুমি আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না।

বেশ, তাই হবে। এ্যাডাম কিন্তু তোমার গান শুনলে খুশী হত।

উনি পাশে বসে থাকলে ভয়ে গলা দিয়ে আমার গানই বেরুবে না।

অ্যানি ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে উঠে যেতে যেতে বলল, ভীষণ ভীতু মেয়ে তো তুমি।

বর্ষা নেমেছে। সমুদ্র তীরের এ অঞ্চলে বর্ষার আলাদা একটা রূপ আছে গল্পের দানবের মত গর্জন তুলে সমুদ্রের জল তোলপাড করতে করতে ঝড এগিয়ে আসে। তাডা খেয়ে উত্তাল ঢেউ আছডে পডে তীরে। জাল-পাই-এর হাহাকার পডে যায়। ছিঁডে খুঁডে উডে যায় ডাল-পাতা, পাখির বাসা, ফুল-ফল-লতা। সপ্ সপ্ চাবুকের মত পেটা বৃষ্টি এসে পডে। চরের সাদা সাদা লোনা মাটি বৃষ্টির জলে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে প্লাবিত হয়ে যায়। জালপাই এলাকায় ঘরবাডি কিছু কম। মাঠের ওপারে ঘন বসতি-পূর্ণ গ্রাম। চর এলাকায় বজ্র বিদ্যুতের খেলা দেখবার মত। জল স্থল আর আকাশ জুডে বিদ্যুতের সে কি সোনালী জাল ছড়ানোর খেলা। ঘন ঘন

মেঘের ডাক, বাজের আওয়াজে মনে হয় যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দামামা বাজছে। বৃষ্টি থেমে গিয়ে প্রকৃতি শান্ত হলে কখনও দেখা যায় তালগাছের মাথায় অথবা তেঁতুলের শাখায় বাজ পড়ে গাছটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

বৃষ্টির সময় মাঝে মাঝে খাজুরীর সাহেবনগর থেকে এ্যাডামের দু-এক-জন বন্ধু আসে। তারা পাঁচতলা লাইটহাউসের ওপর উঠে আকাশ, সমুদ্র আর মাটির ওপর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বৃষ্টির খেলা দেখে।

হিউম সাহেব যদিও এ্যাডামের চেয়ে বয়সে বেশ কিছু বড় তাহলেও উভয়ের বন্ধুত্বে কোন বাধা ছিল না। খুব মজার মানুষ হিউম। যেদিন আসেন সেদিন গল্পে রসিকতায় আসর জমজমাট। হিউমের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও এসেছিলেন এদেশে। কিন্তু বছর তিনেক কাটতে না কাটতেই হিউমের স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে পড়েন। স্বামীর সঙ্গে মনান্তর শুরু হয়ে যায়। শেষে হিউমই ভদ্রমহিলাকে মুক্তি দিয়ে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেন। সেখানে হিউমের স্ত্রী দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন। স্ত্রীর প্রসঙ্গ উঠলেই হিউম বলেন, দুজনেই বেঁচে গেছি। ও আমাকে ছেড়ে আর আমি ওকে ছেড়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি। মিলটা আমাদের মোটেই জুৎসই হয়নি। দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর মেরুতে একটা পেঙ্গুইন ধরে আনলে যেমন হয়। পেঙ্গুইনের দেহটি থাকে উত্তরে মনটা থাকে দক্ষিণে। আমার স্ত্রীর ব্যাপারটাও ঠিক তাই। পেঙ্গুইনে আর যেখানে থাক উত্তর মেরুতে কদাচ নয়।

হিউম কাজ করেন হিজলীর সল্ট এজেন্টের অধীনে। তাঁরই ওপর নির্ভর করে সল্ট এজেন্ট সব কাজ চালান। হিউমের তৈরি ফাইলপত্রের ওপর অন্ধের মত সই করেন সল্ট এজেন্ট। হিউম রসিক মানুষ হলে কি হবে কাজে কর্মে যেমন দক্ষ তেমনি সাচ্চা।

হিউম প্রতি দিন আট মাইল পথ ঘোড়ায় চেপে সাহেবনগর থেকে হিজলীর সল্ট অফিসে যান। পথে বহুবার তাঁকে নামতে হয়। ন্যাংটো, গরীব ছোট ছোট বাচ্চাগুলো তাঁর বন্ধু। কলকাতা থেকে খাবার এলে তিনি তাদের জন্যে নিয়ে আসেন। হোম থেকে খেলনার অর্ডার দিয়ে খেলনা আনেন। বিতরণ করে দেন ছেলেমেয়েদের ভেতর। তাঁর ঘোড়া সামনে যখন ছোটে তখন গাঁ ভেঙে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা 'সাহেব সাহেব' বলে পিছন পিছন অনেক দূর অব্দি ছুটতে থাকে।

সেদিন বর্ষার মেঘ তাল তাল হয়ে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল। কিছু-ক্ষণের ভেতরেই শুরু হয়ে গেল বর্ষণ। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো।

আকাশে মেঘের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঝল্‌সে উঠতে লাগল বিদ্যুৎ।

চারতলায় অ্যানি আর সাগর। সাগর গাইছে শ্রীমতী রাধার অভিসার পালার কয়েকটি গান।

রাধারাণী যাবেন কৃষ্ণ-অভিসারে। কুলবধূ হয়েও তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী। সামনে তাঁর দুটি বাধা। একদিকে গুরুজন পরিজনের বাধা, অন্য দিকে প্রকৃতির। কিন্তু এ সব বাধাকে তুচ্ছ করেই তো প্রিয়-মিলনে যেতে হয়। চলার পথে বাধা পড়লে উচ্ছ্বাসে ফুলে ওঠে নদী। বাধাকে অতিক্রম করে চলে যায়। শ্রীমতি রাধার প্রেমের তরঙ্গিনী তেমনি সব বাধা ডিঙিয়ে চলে যেতে চাইছে। যেতে চাইছে কুঞ্জভূমিতে, যেখানে প্রিয়তম কৃষ্ণ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন শ্রীমতী রাধার জন্য।

কথা শেষ করে গান ধরল সাগর—

'গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ পাতন শব্দ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ॥'

সখি আজ কি দুর্দিন। ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। বাতাস বইছে খরবেগে। বিদ্যুতের চমক সারা আকাশ জুড়ে। ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে পড়ছে বাজ। এ গভীর দুর্যোগে সখি কেমন করে পথ চলি। কিন্তু আমি থাকবই বা কি করে। আমার প্রিয়তম যে আগেই চলে গেছেন সংকেত-কুঞ্জে—

'সজনি, আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল ॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর ॥'

কেবল প্রিয়তম সঙ্কেত-কুঞ্জে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে নেই। তিনি তাঁর প্রিয়তমার আগমন-পথের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে বসে আছেন। কি অধীর প্রতীক্ষা তাঁর চোখে-মুখে—

'পতন্তি পতত্রে বিচলিত পত্রে

শঙ্কিত ভবদুপযানম্

রচয়তি শয়নম্ সচকিত নয়নম্

পশ্যতি তব পন্থানম্।'

কুঞ্জের বাইরে পাতাটি পড়লেও সচকিত হয়ে ভাবছেন, ঐ বুঝি রাধা এলো। অমনি শয্যা রচনা করে চকিত চোখে তাকিয়ে আছেন পথের দিকে।

অবশেষে গুরুজনদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, ঘন ঘোর বর্ষা, বজ্রপাতকে উপেক্ষা করে কুঞ্জে এলেন শ্রীমতী রাধা। প্রতীক্ষার হল অবসান। কৃষ্ণ—

'আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি

জানু উপরে পুন রাখি।

নিজ করকমলে চরণযুগ মোছই

হেরইতে চির থির আঁখি।।'

শ্রীকৃষ্ণ মাধব এগিয়ে গিয়ে রাধাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর জানু পেতে বসালেন। নিজের হাতে রাধার সিক্ত চরণ মুছিয়ে দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে প্রিয়তমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কতক্ষণ পরে গান আর কথা থামল। অ্যানি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল জানালার বাইরে বিদ্যুৎ-চকিত আকাশের দিকে চেয়ে। তার কেবলই মনে হতে লাগল, সে-ই রাধা। চলেছে বর্ষণ-সিক্ত পথের ওপর দিয়ে প্রিয়তমের কুঞ্জে। সেখানে উৎসুক দুটি চোখ পেতে তার আগমন-পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কে?

এ পুরুষ তার অচেনা নয়। উদ্দীপ্ত চোখ, ঠোঁটে ঈষৎ হাসির আভা। সেই স্বপ্নের পুরুষই তো তার কৃষ্ণ।

ভেজানো দরজা খুলে গেল। অ্যানি আর সাগর দুজনেই চমকে তাকাল। দরজার দুটো হাত রেখে এ্যাডাম দাঁড়িয়ে আছে।

সংকোচে কথা বেরুল না সাগরের মুখে। তার বুক তখন দুরু দুরু করে কাঁপছে। অ্যানি হেসে বলল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিলে কতক্ষণ?

সারাক্ষণ।

মাথা নীচু করে বসে আছে সাগর। লজ্জায় তার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল।

এ্যাডাম বলল, অ্যানি, তোমার বন্ধুটি যে এমন চমৎকার গান গাইতে

পারে, এমন সুন্দর করে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে পারে তা আমার কাছে একেবারেই অজানা ছিল। আমি আজ ওর গান না শুনলে অনেক কিছুই হারাতাম।

সাগর এ্যাডামের মুখের এই প্রশংসাটুকু যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তাকে এত সম্মান এত মর্যাদা কেউ দিতে পারে নাকি!

এ্যাডাম আবার বলল, তবে অভিযোগ আমার এই যে এমন ভাল একটি গানের আসরে আমি নিমন্ত্রণ পাইনি। আড়ালে থেকেই শুনতে হল।

অ্যানি হেসে বলল, ওটাই তো মিষ্টি এ্যাডাম।

সাগর চাপা গলায় বলল, ওই যে হিউম সাহেব আসছেন।

জানালা দিয়ে সবার চোখ গিয়ে পড়ল বাইরে।

বৃষ্টিতে ভিজে হিউম আসছেন ঘোড়ায় চেপে। সাদা রঙের তেজী ঘোড়া বৃষ্টিতে যত না কাবু তার চেয়েও বেশী কাদায়। কাদার মোজা পরে হিউমকে পিঠে নিয়ে এগিয়ে আসছে তাঁর ঘোড়া।

হিউমের নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে নেমে গেল এ্যাডাম। অ্যানি জানালা থেকে ছোট একটি বালিকার মত হাত নেড়ে নেড়ে তার খুশী জানাতে লাগল। সেই সুবর্ণ সুযোগে সাগর নিচে বাবার কুঠিতে পালিয়ে বাঁচল।

॥ চার ॥

হিউমের বয়স কিছু বেশী হলে কি হয়, প্রেমের কোন বয়স নেই। তাই বছর পনেরো বয়সের ব্যবধান সত্বেও অ্যানি আর হিউম পরস্পরকে ভালবাসল। এ্যাডামের এতে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। হিউম তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর অ্যানি তার অনেক আদরের বোন।

এখন হিউম আর অ্যানি দুজনে দুটো ঘোড়ায় চড়ে কাউখালির তীর ধরে বেড়াতে যায়। হিজলী অফিসের কাজ সেরে সোজা হিউম চলে আসে লাইটহাউসে। এখানে জলযোগ সেরে নিয়ে অ্যানির সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ে। ঘন্টা দুয়েক ঘুরে ফিরে অ্যানিকে লাইটহাউসে পৌঁছে দিয়ে সাহেবনগরের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রের জনবসতিশূন্য চর আর ঝাউগাছ-এর জঙ্গল মায়ার রাজ্য বলে মনে হয়। সমুদ্রের গর্জনে আশ্চর্য ধ্বনিময় কনসার্ট বেজে ওঠে। ঝাউগাছ-এর কালো বনরেখার ভেতর অজস্র জোনাকী সেই কনসার্টের সঙ্গে সঙ্গে আলোর পরীর মত নৃত্য করতে থাকে। দূরে কোন গাছের তলায় বসে হিউম আর অ্যানি

সে দৃশ্য উপভোগ করে। সমুদ্র থেকে ঝলকে ঝলকে বাতাস বয়ে এলে অ্যানির চূর্ণ চুল মুখে উড়ে এসে খেলা শুরু করে দেয়। অ্যানি অবাধ্য চুল-গুলোকে বাগ মানাবার চেষ্টা করে হিমসিম খায়। হিউম এ দৃশ্যটুকু উপভোগ করে।

তীরের কাছাকাছি কখনো দেখা যায় টিমটিম করে দু-একটা আলো জ্বলছে। ওগুলো জেলে নৌকোর আলো। চতুর্দশী অথবা পূর্ণিমার জোয়ারে জেলেরা বাঁশের খুঁটি পুঁতে তাতে জাল পেতে বসে থাকে। জোয়ারের জল অজস্র মাছ নিয়ে জালের ওপর দিয়ে ঢেউ তুলে এগিয়ে আসে তীরের দিকে তারপর যখন ভাটার টানে জল নেমে যায় গভীর সমুদ্রের দিকে তখন জালগুলো জেগে ওঠে জলের ওপর। ভাটার টানে জল নেমে যাবার সময় মাছগুলো গেঁথে যায় জালের ফাঁসে। জেলেরা ভাটা হলে জাল তুলে আনে ডাঙায়। মাছ ঝেড়ে নৌকোয় তুলে রাখে।

মাঝে মাঝে খেয়াল চাপলেই অ্যানি সমুদ্রের জলে নেমে যায়। পায়ের গোছ ডুবিয়ে জলের সঙ্গে খেলা করে। কখনো দৌড়োতে গিয়ে জলে পড়ে পোশাক ভেজায়। ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। পাশে থেকে হিউম হাত ধরে তোলে। ভেজা পোশাকে হিউমকে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকে অ্যানি। হিউমের পোশাকও ভিজে যায়। হিউম অ্যানির ছেলেমানুষীতে খুশীই হয়। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জলে ভেজা রীতিমত একটা আনন্দের ব্যাপার।

হিউম আর অ্যানি গল্প করে। হিউম বলে, তুমি কি এ দেশে চিরদিন থাকতে পারবে অ্যানি?

চিরদিন থাকব হিউম।

আমি এ দেশটাকে বড ভালবেসে ফেলেছি।

অ্যানি বলে, তোমার মত বেশ কয়েক বছর এ দেশে না থাকলেও অল্প দিনেই আমার কাছে দেশটা বড় প্রিয় হয়ে উঠেছে।

আগামী ডিসেম্বরেই আমরা বিয়ের কাজটা সেরে ফেলব, কি বল অ্যানি?

তুমি যেমন বোঝ তেমনি হবে।

তোমার নিজেরও তো কোন ইচ্ছা থাকতে পারে?

বিশ্বাস কর হিউম, এখন তোমার ইচ্ছাটাই আমার হয়ে গেছে। আমি তোমাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না।

সাগরের প্রসঙ্গ এসে পড়ে কখনো কখনো। হিউম বলে, তোমার এ

দেশীয় সঙ্গিনীটি মনে হয় খুবই ভাল মেয়ে।

তুমি যতটা মনে কর তার চেয়েও ভাল। বন্ধু হিসেবে ওর জুড়ি মেলা ভার।

হিউম বলে, এ দেশের মেয়েদের তো অনেক কম বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, ওর বিয়ে হয়নি কেন এত দিন?

ওর কাছে এ বিষয়ে কোন দিন জানতে চাইনি। ও নিজেও কিছু বলেনি তবে ও গান গাইতে খুবই ভালবাসে। ওই গানের ভেতর দিয়েই ও ওর ভালবাসা জানায় একটি মানুষকে।

সে মানুষটি কে?

কৃষ্ণ।

কোথায় থাকে ওই কৃষ্ণ?

তুমি ভুল করচ হিউম। কৃষ্ণ কোন রক্তমাংসের মানুষ নয়। হিন্দুদের একজন প্রিয় দেবতা।

সাগর কি ভক্ত? ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত?

না না, সে রকম কিছু নয়। লর্ড কৃষ্ণকে নিয়ে গান গাইতে ও ভালবাসে।

হিউম বলে, বিয়ের পর আমরা যখন সাহেবনগরে বসবাস করব তখন তোমার বন্ধুটি কোথায় থাকবে? শুনেছি তোমাকে সঙ্গ দেবার জন্যেই ওকে আনা হয়েছিল। ওর বাড়ি ঘর নেই।

আমি আজকাল ওর কথা ভাবছি হিউম। আমি চলে গেলে সত্যি ও কোথায় যাবে।

হিউম বলে, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যদি টাকার অভাবে বিয়ে না হয়ে থাকে আমরা ওর বিয়ের টাকা যোগাব।

অ্যানি ভেবে বলল, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তুমি লক্ষ্য করে দেখেছ কি এ অঞ্চলের মেয়েদের তুলনায় ও অনেক বেশি সুন্দরী। এ দেশীয় যে কোন জমিদার বাড়ির বউ হবার যোগ্য ও।

এ্যাডাম ওর সম্বন্ধে কোন দিন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেছে কি?

এ্যাডাম ওর গান শুনতে ভীষণ ভালবাসে। আগে এ্যাডামের সামনে সাগর মুখই খুলত না। এখন ভয় ভেঙেছে। এ্যাডামকে গান শোনাতে আর কোন সঙ্কোচ নেই ওর।

হিউম বলে, আমি লক্ষ্য করে দেখছি এ্যাডাম আমার মতই এ অঞ্চলটাকে

ভালবেসে ফেলেছে।

ও তো এ দেশের সব কিছুতেই আগ্রহী।

এ্যাডাম যদি তোমার বান্ধবী সম্বন্ধে আর একটু কৌতূহলী হত তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

উৎসাহে ফেটে পড়ে অ্যানি, আমি এক্ষুণি এ্যাডামকে বলব।

ভুল করো না অ্যানি। বিয়ের ব্যাপারে দুজনের আগ্রহই সবচেয়ে বড় কথা সাগর এখন এ্যাডামের কাছ থেকে দূরে নেই। ইচ্ছে করলে এ্যাডাম তোমার বান্ধবীর কাছে অনায়াসে প্রস্তাবটি রাখতে পারে। ওদের পরস্পরের মন আর ইচ্ছা পরস্পরকে জানতে দাও।

এদিকে লাইটহাউসের ভেতরে এ্যাডাম আর সাগর মুখোমুখি। সাগর অ্যানির কাছ থেকে বুনতে শিখেছে। সে অ্যানির ঘরের মেঝেতে বসে আপন মনে নতুন শেখা বিদ্যেটা অনুশীলন করছিল, এমন সময় ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এ্যাডাম।—আসতে পারি ?

লেস ফেলে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সাগর, এ্যাডাম ঘরে প্রবেশ করে বাধা দিয়ে বলল, উঠতে হবে না, বস।

সাগর মেঝেতে বসে তাকিয়ে রইল এ্যাডামের দিকে। এ্যাডাম একখানা কুর্শীর ওপর বসতে গিয়ে বলল, তুমি যে মেঝেতে বসলে ?

সাগর হেসে বলল, এখানেই আমার কাজের সুবিধে। আপনি আরাম করে কুর্শীতে বসুন।

এ্যাডাম কুর্শীতে বসে বলল, তোমার বান্ধবীটি কোথায় গেল ?

আবার হাসি ফুটল সাগরের মুখে। বলল, সে খবর তো আপনারও জানা।

বিশ্বাস কর সাগর, হিউম কখন এসে ওকে নিয়ে গেছে আমি জানতেই পারিনি।

গত সপ্তাহে জাহাজে একটা বই এসেছে, ছাদে বসে তাই পড়ছিলাম।

আপনাকে প্রায়ই আলোর ঘরে বসে থাকতে দেখি। আপনি সারাক্ষণ ওখান থেকে কি দেখেন ?

নদী, সমুদ্র, আকাশ, বন, প্রান্তর। কেবল পর্বত ছাড়া লাইটহাউসের ওপর থেকে আমি সবকিছু দেখতে পাই। বই আর চারদিকের এই সব ছবি দেখে আমি অনায়াসে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি। তুমিও তো একখানা

॥ এক ॥

চেয়ার ছেড়ে উঠল এ্যাডাম। ঘন কুয়াশা ভোরের দিকে পাতলা হয়ে আসছে। নদীর মোহনায় বসে ধুনুরী রাশ রাশ তুলো ধুনে চলেছে, আর সেই তুলোর রেঁায়াগুলো যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে জালপাই-এর দিকে।

লাইটহাউসের ওপরের ঘরে জানালার গরাদ ধরে সারা রাত সমুদ্রের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে এ্যাডাম। অমাবস্যার জোয়ার লাইটহাউসের নিচের মাটি ভিজিয়ে দিয়ে গেছে।

এ্যাডাম মাঝে মাঝে ওপরে গিয়ে আলোটা ঠিক মত জালানো হচ্ছে কিনা তার তদারকী করে এসেছে। কিন্তু আলো যত উজ্জ্বলই করা হোক না কেন ঘন কুয়াশা ভেদ করে তা সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

বেশ খানিক দূরে একটা জাহাজের বাঁশি বেজে উঠল। পাঁচতলা লাইটহাউসের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে 'তুনিরা, তুনিরা' বলতে বলতে নিচে নেমে এলো এ্যাডাম। চৌকিদারকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলল, চল চল জাহাজ এসে গেছে।

চৌকিদার. সাহেবের কথা শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে হাতে একখানা মোটা লাঠি বাগিয়ে ধরে ছুটে চলল তার পিছন পিছন। ওরা এখন বাহার-ভেড়া (সী-ডাইক) ঘুরে যাবে না। ফসল কাটা মাঠের ওপর দিয়েই সিধে চলে যাবে খাজুরী বন্দরে। কাউখালির বাতিঘর থেকে পাঁচ মাইল বন্দরের পথকে ওরা সাড়ে তিন মাইল কমিয়ে ফেলবে।

মাঠের পথ এখন চলার পক্ষে বড় একটা সুবিধের নয়। ধান কাটা হয়ে যাবার পর সারা মাঠ জুড়ে বসে আছে ধানগাছের শুকনো গোড়াগুলো।

চৌকিদার গ্রাম্য লোক। এ সব অঞ্চলের মানচিত্র তার মুখস্ত। সাহেবকে বারবার পড়তে দেখে সে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, সাবধান সাহেব, নাড়া বুদা।

এ্যাডাম ধানগাছের কেটে নেওয়া অংশে বুটের ঠোকর মেরে বলল, ড্যাম ইয়োর নাড়া বুডা। বলার সঙ্গে সঙ্গেই শিশির-ভেজা পিচ্ছিল মাটির ওপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এ্যাডাম।

চৌকিদার টেনে তুলতে যেতেই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল। বলল, জোরে জোরে চল। জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে অ্যানি

আমাকে দেখতে না পেলেই আপসেট হয়ে পড়বে।

কুয়াশার জন্য সারা রাত কি উদ্বেগেই না কাটিয়েছে এ্যাডাম। কাউখালির বাতিঘরের চার্জ নিয়ে সে খাজুরী অঞ্চলে এসেছে আজ তিন বছর। তার আসার আগে সাত বছর যিনি এই লাইটহাউসের চার্জে ছিলেন সেই উইলিয়াম রীড নামের মধ্যবয়সী মানুষটি তাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন, ইয়ং ম্যান, জায়গাটা নির্জন, খুবই নির্জন, কিন্তু নিঃসঙ্গ মনে হবে না কোন দিন।

কথাটা এ তিন বছরে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে এ্যাডাম। প্রথম প্রথম মিডল্‌সেক্সের স্মৃতি তাকে বড় পীড়িত করত। রেভারেণ্ড টমাস ব্রাকেনের এক ছেলে এক মেয়ে। এ্যাডামের যখন তের বছর বয়েস আর অ্যানির আট তখন টমাস ব্রাকেন বিপত্নীক হন। শহরতলীর এক চার্চে কাজ করতেন টমাস ব্রাকেন। সৎ নিষ্ঠাবান ক্রীশ্চিয়ান। ভোরবেলা ছেলেমেয়ের হাত ধরে যখন বের হতেন প্রাতঃভ্রমণে তখন আশপাশের কৃষক, শ্রমিক, পশুপালকেরা তাঁর মুখোমুখি হলেই উপদেশ, পরামর্শ আর আশীর্বাদ চাইত। রেভারেণ্ড ব্রাকেন মানুষের হৃদয়ের ভেতর পৌঁছে তাকে আশ্বস্ত করত।

ভোরবেলা উঠে রেভারেণ্ড ব্রাকেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে প্রার্থনায় বসতেন। শিশুকাল থেকে প্রতি দিন ঐ প্রার্থনার অভ্যেসটি থেকে গেছে ভাইবোনের। প্রার্থনার শেষে রেভারেণ্ড কোন দিন বলতেন, জল যেমন পাত্রের গায়ের ময়লা পরিষ্কার করে তেমনি প্রার্থনা মনের ওপর জমে ওঠা ময়লা পরিষ্কার করে।

আবার কোন দিন বলতেন, মনের স্বাস্থ্য যদি ভাল রাখতে চাও তাহলে প্রতি দিন নতুন চোখ আর মন নিয়ে প্রকৃতিকে দেখার চেষ্টা কর। প্রকৃতির মত শিক্ষক নেই। সে তোমাকে প্রতি দিন নতুন পাঠ দেবে।

শুধু ভাল ভাল কথাই বলতেন না রেভারেণ্ড ব্রাকেন, ভোরবেলা ক্ষেতখামার আর বনের ভেতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ছেলেমেয়েকে প্রতিটি ফুল, লতা-পাতা, গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। প্রতিটি ঋতু শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের নিয়ে যেতেন। ঋতুর ছোঁয়ায় গাছেদের কি পরিবর্তন ঘটছে তা পরিষ্কার দেখিয়ে তিনি ছেলেমেয়েকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন।

কৃষকরা ক্ষেতে কাজ করছে দেখলেই ছেলেমেয়েকে বলতেন, এদের

কোন দিন অবজ্ঞা কোরো না। এরা তোমাদের জীবনধারণের জন্য সব-কিছু দরকারী জিনিসই যোগান দেয়। শুধু তাই নয়, বিধাতার পরে এরাই সবচেয়ে বড স্রষ্টা।

বাবা মারা গেলেন হৃদরোগে। চার্চে প্রার্থনারত অবস্থায়। এ্যাডামের কুড়ি বছর ছুঁতে তখন দু মাস বাকী। আর অ্যানি তখন পঞ্চদশী। বাবার প্রতিবেশী বন্ধু আঙ্কল সেসিল কনভেন্টে পডাশোনার ব্যবস্থা করে দিলেন অ্যানির। আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক পরিচিত ব্যক্তিকে ধরে এ্যাডামের জন্য পোর্টের একটা চাকরি জোগাড করে পাঠিয়ে দিলেন ইণ্ডিয়াতে।

নির্জন সমুদ্রতীরের এই বাতিঘরটি কিন্তু এ্যাডামের কাছে এখন আর নিঃসঙ্গতার গুরুভার বলে মনে হয় না। এ্যাডামকে বাদ দিয়ে পাঁচটি লোক থাকে এখানে। চৌকিদার ভুবন ভক্তা, ঝাড়ুদার কুমর শামল, আলো জ্বালাবার দুটি লোক আমানত আর ইয়ার আলি। এ ছাড়া সাহেবের খিদমতগার অর্জুন বাগ।

ভুবন ভক্তা ছাড়া বাকী চারজন পেটুয়া গাঙের ওপারে দরিয়াপুর অঞ্চলের লোক। ভুবন ভক্তার আদি নিবাস খাজুরী বন্দরের কয়েক মাইল দূরে বৈষ্ণবচক গ্রামে। এই গ্রামটি এককালে ছিল বৈষ্ণব প্রধান। ভুবন ভক্তার বাপ পিতামহ সবাই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিল। গৃহস্থ বৈষ্ণবরা এ অঞ্চলে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সৎকুলী আর অনন্তকুলী। এদের রীতি-নীতি আচার-আচরণে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সৎকুলীরা স্বজাতীয়া মেয়েদের সঙ্গেই কেবল কণ্ঠি বদল করে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, করণ, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় যারাই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হোক না কেন, বিয়ের সময় স্বজাতীয়া মেয়েকেই কেবল তারা গ্রহণ করে। মহোৎসবের সময় বিভিন্ন জাতীয় সৎ-কুলীরা স্ব স্ব জাতিকে নিয়ে পৃথক পৃথক পঙক্তিতে বসেই প্রসাদ পায়। অন্য দিকে অনন্তকুলী বৈষ্ণবদের ও-সব বাদ-বিচার নেই। বিয়ে থেকে ভোজন সব জাত একাকার।

ভুবন ভক্তা সৎকুলী বৈষ্ণব হয়েও যৌবনে এক কাণ্ড করে বসেছিল। গান পাগল ভুবন কীর্তনানন্দে মত্ত হয়ে এক সময় পথে প্রান্তরে খোল করতাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। লোকে তাকে ঘরে ডেকে ডেকে কীর্তন শুনত। এমনি একদিন পথ চলতে চলতে সে তাম্রলিপ্তের অন্তর্গত মীরপুর গ্রামে এসে পড়ে। সেখানে ক'ঘর ফিরিঙ্গী খ্রীষ্টানের বাস। কার্য উপলক্ষে একদল

পর্তুগীজ এক সময় ঐ অঞ্চলে আসে। তারা আর দেশে ফিরে যায়নি। দেশীয় মেয়েদের বিয়ে সাদি করে সংসার পেতে থেকে যায়। তাদের সন্তান সন্ততিদের লোকে বলত ফিরিঙ্গী।

মীরপুরের সেই ফিরিঙ্গী পাড়ায় এসে আটকে গেল ভুবন ভক্তা। ভুবনের গান শুনে ফিরিঙ্গীরা তাকে আর ছাড়তেই চায় না। প্রতি দিন ভাল রকমের ভোজ দিয়ে তাকে আটকে রাখল তারা। এদিকে ভুবনের চোখ পড়েছে ফিরিঙ্গী এক মেয়ের ওপর। নজর কেড়ে নেবার মত রূপ। মেয়েটিও ভুবনের তরুণ গলার গান শুনে মুগ্ধ।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কথা ভুবন তার দরদভরা গলায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলত। তারপর কীর্তন। আখর দিয়ে কীর্তন। আসর একদম মাৎ। তরুণী মেয়েটি তখন তার চোখে হয়ে যেত রাধারাণী।

শেষে একদিন ফল মিলল। রাতের অন্ধকারে ফিরিঙ্গী মেয়েটিকে নিয়ে অকূল দরিয়ায় ভাসল ভুবন। এক সময় অনেক গাঁ-গঞ্জ ঘুরে ভুবন ফিরে এলো আপন ঘরে। সব শুনে বৈষ্ণব মহাজনেরা বিচারে তাকে এক ঘরে করল। তাতেও যখন টলল না ভুবন, তখন শুরু হল হাটে মাঠে ঘাটে তার ফিরিঙ্গী বউটাকে নিয়ে টানাটানি। শেষে সমাজের সঙ্গে যুঝতে না পেরে ভুবন অন্তঃসত্ত্বা বউ নিয়ে চলে এলো কাউখালি বাতিঘর থেকে কিছু দূরে নির্জন জালপাই-এর জঙ্গলে। নিজের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে সে তুলল একটা ছোটখাট কুঁড়ে। তারপর কাজ খুঁজতে খুঁজতে এলো খাজুরী বন্দরে। এখানে গান শুনিয়ে দুটো পেট চালানো ভীষণ দায়। শুরু হল কায়িক পরিশ্রম। সিকেয় উঠল গান। জাহাজ থেকে মাল বাজারে বয়ে আনত ভুবন ভক্তা। সারাদিন পরিশ্রমের পর যা পেত তাই নিয়ে আসত তিন চার মাইল হেঁটে জালপাই সীমানায় তার বসত বাড়িতে।

প্রথম মেয়ের জন্ম দিতে গিয়েই মরল ভুবনের বউ। কিন্তু বেঁচে গেল সন্তানটি। সব হারানোর মাঝে ভুবনের সান্ত্বনার ঐ একটি মাত্র আশ্রয়। তাকে ফেলে কাজে বের হওয়া অসম্ভব। আবার কিছু রোজগার না হলেও যে দিন চলে না। তাই শিশু কোলে নিয়েই শুরু হল আবার গান ও ভিক্ষে।

ছোটবেলা থেকেই সাগর বাবার গলায় গান শুনে গানের বড় ভক্ত হয়ে উঠেছিল। সে খুব শৈশব থেকেই বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইত। ভুবনের সঙ্গে বালিকা সাগর যখন গান গাইত তখন চারদিকে ভীড়

জমে যেত। তার বাঁশির মত মিষ্টি গলা শ্রোতার কানের ভেতর দিয়ে একেবারে প্রাণ ছুঁয়ে দিত।

সাগর যখন চোদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পড়ল তখন তার ফিরিঙ্গী রক্তের বাড়বাড়ন্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে পথচারীর আর চোখ ফিরত না। সাগর তো মেয়ে নয়, যেন কারিগরের তৈরি প্রতিমা। কে বলবে ভুবন ভক্তার মত অতি সাদামাঠা চেহারার একটি মানুষ তার বাপ।

বয়েস হয়েছে, অমনি ফেউ লেগে গেল মেয়ের পিছনে। কোথাও শান্তি নেই। বাইরে কোথাও গান করতে গেলে পিছু লাগে দুষ্ট লোক। ঘরে ফিরে এলেও ধাওয়া করে ঘর অব্দি। রাত-বিরেতে যখন নির্জন জালপাই জঙ্গলে মানুষের আসা-যাওয়া, কানাকানি শুনল ভুবন তখন আর ঐ জায়গায় সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে একা একা থাকা নিরাপদ মনে করল না। সে একদিন ভোররাতে মেয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালাল।

প্রথমে এলো সে নিজের গাঁ বৈষ্ণবচকে। যদি বৈষ্ণবকুলে বিয়ে দিয়ে মেয়ের একটা হিল্লে করতে পারে। কিন্তু সমাজপতিরা তখনও অনড়। ভুবনের মেয়েকে পার করার প্রশ্নই ওঠে না। শেষে বা যদিও অনন্তকুলী সম্প্রদায়ের দু-চারজন এগিয়ে এলো, তাদের দেখে ভুবনের কিন্তু প্রাণ চাইল না। সব কটাই প্রায় গলিত নখদন্ত। কেবল লালসার আগুন জ্বলছে চোখে।

সেখান থেকে পালিয়ে এলো হিজলীতে। হিজলী বন্দরের তখন আর সে রমরমা নেই। তাহলেও হিজলীর পাশে মেহেদীনগর তখনও বাজার হাটে, লোকজনের আনাগোনায় সরগরম। বাপ আর মেয়ে একটা চটিতে রাত কাটাল। সেই চটিতেই আলাপ চটির মালিক পিতাম্বর দাসের সঙ্গে! পিতাম্বরের সহৃদয়তার জালে জড়িয়ে পড়ল ভুবন আর তার মেয়ে।

পিতাম্বরের মধ্যস্থতায় সাগরের বিয়ে হয়ে গেল। জমিদার হরশঙ্কর তাঁর একটি বাগান বাড়িতে সাগরের সঙ্গে কণ্ঠি বদল করলেন। বাগান বাড়িতেই স্থান হল সাগরের। দালাল পিতাম্বর দাস ভুবনকে বুঝিয়ে বলল, এই তো ভাল হল ভায়া। পুরো একটা বাগনবাড়ির অধিকারী হল তোমার মেয়ে। জমিদারের খাসমহলে তিন সতীনের ঠেলাঠেলির ভেতর না থেকে একা এই রাজত্বে জমিদারবাবুর পেয়ারে থাকবে তোমার মেয়ে। কিন্তু ভায়া, একটি কথা মনে রেখ, জমিদারদের কায়দা-কানুনই আলাদা। মেয়েকে দেখব বলে হপ্তায় হপ্তায় বাগানবাড়িতে ছুটে এসেছ কি মরেছ। দেউড়ির সামনে দরোয়ানের ধাক্কা খেয়ে ফিরতে হবে।

কথা শুনে মুখখানা শুকিয়ে গেল ভুবনের। পিতাম্বর দাস অভিজ্ঞ দালাল। মানুষের মন বুঝতে তার একটুও দেরি হয় না। সে অমনি সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এ কত বড় সৌভাগ্য যে হরশঙ্করবাবুর মত জমিদার তোমার মত ভিখিরী বোষ্টমের মেয়েকে পছন্দ করে বিয়ে করেছেন। মেয়ের মঙ্গল হোক এই তো তুমি চাও, তাহলে না-ই বা এলে মেয়ের কাছে। আসল কথা তোমাকে শ্বশুর বলে স্বীকার করতে এত বড় জমিদারের অপমানে মাথা কাটা যাবে না? মেয়ের ভাল যদি চাও বু‍ঝে-সু‍ঝে কাজ কর ভায়া।

পিতাম্বরের কথা মত সেই যে ভুবন ভক্তা মেয়েকে মেহেদীনগরের জমিদারের বাগানবাড়িতে ফেলে এলো আর সে-মুখো হল না একটি বছর। মন কাঁদে তবু যেতে পারে না সে। বড মানুষের বাড়ির বড ব্যাপার। মনকে সান্ত্বনা দেয় ভুবন, সমাজ যে মেয়েকে নেয়নি, সে যে জমিদার ঘরণী হয়েছে সে কি কম ভাগ্যের কথা। মেয়ে তার সুখী হোক, আনন্দে থাকুক, রাধামাধবের কাছে এই তার প্রার্থনা।

ইতিমধ্যে খবর রটল, জমিদারের হাত থেকে নুনের কারবার সরকার পুরোপুরি গ্রহণ করবে। আর সেই সঙ্গে নিয়ে নেবে জালপাই-এর জঙ্গল। নুন তৈরির জন্যে চাই জঙ্গলের কাঠ।

যে জমিদারের অনুমতি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঘর তুলেছিল ভুবন ভক্তা সেই জমিদার সরকারের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে তাড়াতাড়ি জালপাই মহালটি বেচে দিল অন্য জমিদারের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন জমিদারের পাইক এসে ভেঙে দিয়ে গেল ভুবন ভক্তার ঘর।

নিরাশ্রয় ভুবন পাঁচজনকে ধরে হিজলীর সল্ট এজেন্ট ফার্গুসন সাহেবের কাছ অব্দি পৌঁছল। ফার্গুসন তার দুঃখের কথা শুনে লাইটহাউসের চৌকিদারের কাজটা যোগাড় করে দিলেন।

কাউখালি থেকে মেহেদীনগর দু' আড়াই ক্রোশ পথ। একদিন বাতিঘরের সাহেবের অনুমতি নিয়ে সে মেহেদীনগর গেল মেয়েকে দেখতে। কিন্তু তখন আর সাগর ছিল না জমিদার হরশঙ্করের বাগানবাড়িতে। অনেক উঁকিঝুঁকির পর দেখা হল জমিদার বাড়ির এক বুড়ো চাকরের সঙ্গে। লোকটি ভালই বলতে হবে। ভুবন ভক্তার পরিচয় জেনে সে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, মেয়েটি তোমার বড ভাল বাপু। আমাকে বাপের মত ভক্তি করত। আমি জানতাম, জমিদারবাবু যে নুন আর কাপড়ের ব্যবসা

করেন তার সঙ্গে কোম্পানির লোকের যোগাযোগ আছে। এই বাগানবাড়িতে জমিদারবাবু সাহেবদের খানাপিনা আর ফুর্তির ব্যবস্থা করে দেন। এক একটি মেয়েকে আনেন সাহেবদের ভোগের জন্যে। তোমার মেয়েটিকে দেখে বাপু আমার মন কেমন করত। তাই মাসখানেক আগে যখন জানলাম সাহেবদের জোর খানাপিনার ব্যবস্থা হবে তখন মাকে আমার সব কথা খুলে বললাম। মা আমাকে 'বাবা' বলে ডাকল আর চোখের জল ফেলে আমার সাহায্য চাইল। তখন আমি বললাম, বাঁচতে চাও তো যে-দিকে দু'চোখ যায়, পালাও। বলে আমি তার পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলাম।

ভুবন ভক্তা বলল, তুমি তার সত্যিকারের বাপ, আমি জন্ম দিয়েছি মাত্র।

ভুবন মেহেদীনগর থেকে চলে আসার সময় ভাবল, নিশ্চয়ই অভাগী মেয়েটা বাপের খোঁজে গিয়েছিল জালপাই-এর-জঙ্গলে। দেখা না পেয়ে ফিরে গেছে।

ভুবন দুঃখ পেল, কিন্তু মনে মনে শান্তি পেল এই ভেবে যে মেয়েটাকে অসহায় পেয়ে কুকুর শেয়ালগুলো ছিঁড়ে খেতে পারেনি।

মাস ছয়েক পরে মেয়ের সঙ্গে আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে গেল ভুবনের।

ভর সন্ধ্যেয় খাজুরীর বাজার থেকে সওদা করে লাইটহাউসে ফিরছিল ভুবন, হঠাৎ এককলি কীর্তন কানে আসতেই থমকে দাঁড়াল। জায়গাটা ভাল নয়। সাহেব-নগরের দক্ষিণে বাঁশ, চালতা আর বাদাম বনের ভেতর দশ বারো ঘর পতিতার বাস। বন্দরের লোক-লস্কর, ব্যবসায়ী, এজেন্ট, সল্ট আর পোর্ট ডিপার্টমেন্টের বাবুরা এই পল্লীতে আসা যাওয়া করেন। বহু রাত অব্দি মদ আর মেয়ের সঙ্গ লাভ করে দূর করেন সারাদিনের জমে ওঠা ক্লান্তি।

গান শুনে নিষিদ্ধ পল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে গেল ভুবন। এ গলা তো তার অচেনা নয়। যদিও গায়িকা চাপা গলায় গাইছে তবু এ সাগরের গলা না হয়ে যায় না।

হঠাৎ বুকের ভেতর দারুণ এক ধরণের যন্ত্রণা অনুভব করল ভুবন। সাগরের মৃত্যুর খবর শুনলেও বোধ করি এর আদ্দেক দুঃখ পেত না সে। আজ এই পরিণতিও দেখতে হল তার মেয়ের।

এ পথে বড় একটা কেউ যাওয়া আসা করে না। কিন্তু এই জংলা

রাস্তাটাই কাউখালির দিকে যাবার সোজা রাস্তা। অবশ্য এ পথে গেলে মাঠ পেরিয়েই যেতে হয়। সন্ধ্যের মুখোমুখি পড়ে পথ কমাতে গিয়ে এই বিপর্যয়।

পা বাড়াতে যাচ্ছিল অমনি পিছন থেকে হাত ধরল একটি মেয়ে। খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, কি গা সাঁঝবেলার নাগর, বলি পালাচ্ছ কোথা ?

ভুবন বলল, হাত ছাড, আমি বাতিঘরে যাচ্ছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ঠায় দাঁড়িয়ে আছ চালতাতলায়। বলি কার কথা ভাবছিলে ?

হঠাৎ কি মনে এলো ভুবনের। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা, আচ্ছা মেয়ে, ঐ যে একটু দূরে গাছতলায় কুঁড়েটা—ওখানে কে গান গাইছে ?

গান নয় গো, ঠাকুরের নামগান। গাইছে আমাদের সাগর। পুণ্যবতী মেয়ে গো, কপালগুণে এসে পডেছে এখেনে।

ভুবন নিজের পরিচয় না দিয়ে বলল, এখানে এসে পড়েছে মানে ?

মাসীর আমদানি গো, মাসীর আমদানি। তবে আমাদের মত পাপ কাজে নেই ও। মাসী ওকে নিজের বাড়ীর একধারে ঠাঁই দিয়েছে। রোজ ওর গলায় কেত্তন শোনা চাই মাসীর। আমরা আডালে আবডালে থেকে শুনি। মাসী দেখতে পেলেই তাডা করে আসে। নরকের কীটের আবার সগ্‌গে যাবার সখ।

শেষ কথাটা বলেই আবার হেসে উঠল মেয়েটি। এবারের হাসিটা শোনাল বুক থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা একধরনের চাপা কান্নার মত।

এর পর রসদ আনবার জন্য এই পথেই যাতায়াত শুরু করল ভুবন। যদি মেয়েটার সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যায়। হলও তাই। এক দুপুরে ঐ পথ ধরে যাচ্ছিল সে। চালতাতলায় দাঁড়িয়ে আঁকশি দিয়ে চালতা পাড়ছিল সাগর। ভুবন কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকল, সাগর। অমনি হাতের আঁকশিটা মাটিতে পডে গেল। ঠিক চিনতে পেরেছে সাগর বাপের গলা। একটা আট বছরের মেয়ের মত পডি-কি-মরি করে দৌডে এসে ভুবনকে জডিয়ে ধরে সে কি কান্না।

শেষে বনের আড়ালে গিয়ে মেয়ে বাপে পরামর্শ হল। বাপের সঙ্গে এখুনি পালিয়ে যেতে পারে সাগর কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। বিপদের দিনে মাসী তাকে পথ থেকে ধরে এনে আশ্রয় দিয়েছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

তাকে পাপ কাজ করতে বাধ্য করেনি। আলাদা থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে চালতাতলার কুঁড়েটাতে। কাজের ভেতর ঢেঁকিতে কখনো-সখনো ধানভানা আর দুটি প্রাণীর রান্নাতে হাত লাগানো। খাইখরচা সব মাসীর। সন্ধ্যে হলে একটি দুটি করে কেত্তন শোনাতে হবে মাসীকে। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে মাসী বেরিয়ে যায় জ'হাজঘাটার দিকে খদ্দেরের খোঁজে। তখন সুযোগ বুঝে মেয়েরা এসে ভীড় জমায় সাগরের চারদিকে। কেউ বলে, সগ্গের দেবী গো দেবী। আবার কেউ বায়না ধরে রাধাকৃষ্ণের পালা শোনাবার জন্যে। সবার সব আবদারই রাখার চেষ্ঠা করে সাগর। বড ভাব জমে গেছে সাগরের এই দুঃখী মেয়ে-গুলোর সঙ্গে। তারা তাদের দুঃখের কাহিনী সাগরেঃ কাছে বলে সান্ত্বনা পায়। ওদের দীর্ঘশ্বাস সাগরের বুকে এসে বাজে।

সাগর বলল, বাবা আমি এখানে বেশ আছি।

ভুবনের গলায় উদ্বেগ; কিন্তু মা এ যে বেশ্যাপল্লী!

সাগর বলল, তোমার ঐ জমিদারের বাগানবাড়ি কি এ জায়গাটার চেয়ে ভাল ছিল বাবা?

তবু তোকে এখানে দেখলে লোকে বলবে, তুই পতিতাপল্লীর মেয়ে। তাছাড়া যারা এখানে আসে তারা তোকে উত্যক্ত করতে পারে।

সাগর বলল, এই মেয়েগুলোকে কিংবা ওদের কাছে যারা আসে তাদের বোঝা যায়, কিন্তু ভাল মানুষ সেজে সংসারে যারা ঘোরে তাদের বোঝা কঠিন।

একটু থেমে বাবার বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তুমি কিচ্ছু ভেব না বাবা, মাসীর কাছে আমি খুব নিশ্চিন্তে আছি। মাসীকে আমি বলে রাখব, তুমি যখন খুশি এসে দেখা করে যেও।

সেই থেকে কাউখালির বাতিঘরের চৌকিদার ভুবন ভক্তা মনের শান্তিতেই আছে। মেয়ে ভদ্রসমাজে থাকলে যে দুশ্চিন্তা পতিতাপল্লীতে থাকায় সে দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে সে।

॥ দুই ॥

দূরে মোহনার কাছাকাছি 'দুনিয়া' জাহাজটি নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে। কতকগুলো ছোট বড় নৌকো জাহাজের কাছে যাওয়া আসা করছে। ইতিমধ্যে কুয়াশা কেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যের আলো।

শীতের নীল জলে সে আলোর ঝিলিক। ওদিকে বালির চরে গাঙচিলের মেলা। রাতে মাছ ধরার দু-একটা নৌকো ইতিমধ্যে ডাঙার এসে জাল থেকে মাছ ঝাড়ছে। সমুদ্রের দিকে এখনও অনেক জেলে-নৌকো ভেসে আছে।

তীরের মত জল কেটে ছুটে আসছে চারটে ছিপ নৌকো। কলকাতার খবর কাগজওয়ালাদের নৌকো ওগুলো। জাহাজ থেকে তাজা বিলিতি খবর সংগ্রহ করে খাজুরী থেকে পাড়ি দেবে ওরা কলকাতা। যে আগে পৌঁছবে তার খবর ছাপা হয়ে আগে বেরুবে। তাই শুরু হয়ে গেছে ছিপের দৌড়-প্রতিযোগিতা। এ্যাডাম আর ভুবন ভক্তা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে দূরের জাহাজটার দিকে। জাহাজ থেকে ফিরে আসছে যে সব নৌকো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেগুলোকে লক্ষ্য করছে ওরা। এ্যাডামের মনে সংশয় দানা বেঁধে উঠছে, তাহলে কি আগের চিঠির পরিকল্পনা মত দুনিরাতে আসতে গিয়েও অনিবার্য কোন কারণে এ জাহাজ ক্যানসেল করেছে অ্যানি ?

নৌকোগুলো সব একে একে তীরে এসে গেছে। মাঝিমাল্লারা পোর্ট শ্রমিকদের মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছে মালপত্র। লোকজন চর পেরিয়ে এগিয়ে আসছে সাহেবনগরের দিকে। ভোর রাতে জোয়ারের জল অনেক দূর অব্দি বেলাভূমি ভিজিয়ে দিয়ে এখন ভাটার টানে সরে গেছে। তাই অনেকখানি জায়গা ঘাসের সঙ্গে কাদাবালির মাখামাখিতে পিচ্ছিল হয়ে আছে। কয়েকজন বালুবস্তির লস্কর কুর্শিতে বসিয়ে বয়ে আনছে দুটি ইংরেজকে। জাহাজ এলে হোম থেকে অনেকেই আসে খাজুরীতে। কেউ ব্যবসার সূত্রে, কেউ চাকরি নিয়ে কেউ কলকাতার পথে, কেউ বা ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায়।

নাঃ, অ্যানি আসেনি। এ্যাডাম যখন অ্যানির আশা ছেড়ে দিয়ে ফেরার উদ্যোগ করছে তখন হঠাৎ ভুবন চেঁচিয়ে উঠল, সাহেব, ঐ একটা সাদা নৌকো জাহাজের কাছ থেকে আসছে।

ফিরে দাঁড়াল এ্যাডাম। কিছুক্ষণের ভেতর নৌকোটা ভিড়ল ডাঙায়। এ্যাডাম জানে ঐ নৌকোয় ক্যাপ্টেন কিংবা দু'নম্বর তিন নম্বর অফিসাররাই যাতায়াত করে। হ্যাঁ ঐ তো, একটি মেয়ের হাত ধরে এগিয়ে আসছে একটি পুরুষ। সাহেবনগরের দিক থেকে কুর্শি নিয়ে পিছল বেলাভূমির ওপর দিকে ছুটছে দুটো মাল্লা। তারা কাছাকছি পৌঁছে গেছে। হাত নেড়ে কি কথা হল। ফিরে যাচ্ছে শূন্য কুর্শি সাহেবনগরের দিকে। ওরা দুজনে এগিয়ে

আসছে হাত ধরাধরি করে পোর্ট অফিস লক্ষ্য করে।

অ্যানি! অ্যানি! দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল এ্যাডাম।

অ্যানি উত্তেজনায় হাত নেড়ে দৌড়তে গিয়ে পিছল মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, সঙ্গীটি জোর করে হাত ধরে টেনে তাকে পতনের হাত থেকে বাঁচাল।

কাছে আসতেই এ্যাডাম কতক্ষণ ছোট বোনের মাথাটা চেপে রইল বুকের মধ্যে। জাহাজের মিডশিপম্যান অভিবাদন বিনিময় করে চলে গেল পোর্ট অফিসের দ‍ে ।

ভুবন বলল, কোন্ পথে যাব সাহেব?

এ্যাডামের সোজা উত্তর, যে পথ দিয়ে আসা হয়েছে।

কিছুটা ইতস্তত করে ভুবন বলল, কিন্তু হুজুর, আপনি ওপথে চলতে পারেন, মেমসাহেব কি পারবেন?

অফকোর্স, অ্যানি আমার বোন আছে। পারবে না মানে! ও, তোমার ঐ কি যেন আছে মাঠে?

কি হুজুর?

ধান্যবৃক্ষের গোড়া।

নাড়াবুদা।

হো-হো করে হেসে উঠে অ্যানির দিকে চেয়ে এ্যাডাম বলল, নাড়াবুডা, নাড়াবুডা।

ফ্যাল ফ্যাল করে দাদার দিকে তাকিয়ে অপরিচিত শব্দের ধ্বনি বৈচিত্র্যে পুলকিত হয়ে উঠল অ্যানি!

সেই চালতা তলার পথ পেরুতে গিয়ে অ্যানি অবাক হয়ে দেখল, খড়ে ছাওয়া ঘরের সামনে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি মেয়ে। চোখে উৎসুক দৃষ্টি।

অ্যানি জানে না ওরা কারা। কয়েকটি এদেশীয় মেয়েকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে সে তো মুগ্ধ। পারলে যেন তখুনি ভাব জমায়। ভুবন ভক্তা ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে জোর কদমে মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

এ্যাডাম অ্যানির হাত ধরে ভুবনের পিছু ধাওয়া করতে করতে বলল, অশ্বের মত লম্ফ দিয়ে যাচ্ছ কেন? ধীরে ধীরে পা চালাও।

মাঠের শিশির অনেক আগেই শুকিয়ে গিয়েছিল, তাই পতনের সম্ভাবনাও কমে গিয়েছিল। তবু উঁচু নীচু এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে চলতে

অ্যানির শৌখিন জুতোর ঠোকর লেগে রঙ চটল। দু-একবার পড়তে পড়তে টাল সামলাল দাদার হাত ধরে। শেষে বোনকে সামলাতে গিয়ে একবার ভাই বোন দুজনেই পড়ল।

নির্জন পরিবেশে বাতিঘরের সুন্দর সংসারটি বড় ভাল লেগে গেল অ্যানির। কাউখালির চওড়া খালে সমুদ্রের জোয়ার এলে থৈ থৈ ভরে গিয়ে কূল উপচে ওঠে। মেছো নৌকোগুলো বাঁশের খুঁটি পুঁতে জাল পাতে। ভাটার সময় নৌকোতে জাল গুটিয়ে মাছ ঝেড়ে নেয়। মহা ব্যস্ত হয়ে মাছের লোভে পাখিগুলো এলোপাথাড়ি উড়ে বেড়ায়। বাতিঘরের জানালা দিয়ে সে দৃশ্য দেখে অ্যানি খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে। রাতের খালের বাঁকে বাঁকে জেলে নৌকোয় টেমির আলো জ্বলে। চারতলায় নিজের বিছানায় শুয়ে অনেক দূর অব্দি সেই টুকরো টুকরো ছবি দেখে অ্যানি। রাতে কখনো বা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় একেবারে ওপরে, যেখানে আলো জ্বলছে, আমানত অথবা ইয়ার আলি বসে আছে। ওরা অ্যানিকে দেখলেই উঠে দাঁড়ায়। অ্যানি ওদের বসতে বললেও বসে না। বাতিঘরের আলো উত্তর ও উত্তর পূর্বে ছিয়ানব্বই ডিগ্রিতে ছড়িয়ে পড়ে। অর্ধবৃত্তাকার ঐ আলো মেঘ ও কুয়াশামুক্ত রাতে প্রায় পনেরো মাইল অব্দি দেখা যায়। রাতে ঐ বাতিঘরের আলোয় গঙ্গার মোহনার বিপুল জলরাশির দৃশ্য দেখে অ্যানি। কখনো অদূরে দেখা যায়, জল কেটে জাহাজ চলেছে খাজুরী ঘাটের দিকে। জ্যোৎস্না রাতে সমস্ত চরাচরই মায়াময়। বাতিঘরের উত্তরে জালপাই এর বন। কোন বসতি নেই সেখানে। গামা, গরান, হাব্‌লি গাছের জঙ্গল। দু একটা সরু সরু নাশিখাল বনের ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়েছে কাউখালির প্রশস্ত খালে। এ সব ছোট ছোট নালার মত খালেও জোয়ার ভাটা খেলে। দূরে কাছে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা এই সব নাশিখালে চেঁওয়া, খলসা মাছ ধরে। তাছাড়া খালের পাশের গর্তে সুন্দ্‌রা কাঁকড়া বসে থাকে। দড়ির আগায় শুঁট্‌কি মাছ বেঁধে গর্তের ভেতর ফেলে দেয় ছেলেমেয়েরা। শুঁট্‌কি কামড়ে ধরলেই হাতের বশে টেনে তোলা হয় কাঁকড়াকে। তাছাড়া মাছ ধরার ফন্দিফিকির যাদের একেবারে রপ্ত তারা গর্তের ভেতরেই হাত চালিয়ে তুলে আনে কাঁকড়া। ধারালো দাড়ায় কামড়ে রক্তাক্ত করে দেয় হাত। ওতে কিন্তু মাছ ধরার নেশা যায় না।

এ সব দেখতে ভালবাসে অ্যানি। সে একা একা ঐ সব জালপাই-এর

জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তাকে দেখলেই মাছ ধরা ফেলে রেখে গ্রামের অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। অ্যানি ওদের সঙ্গে খালে নেমে মাছ ধরতে চায়। ভাটায় যখন নাশিখাল প্রায় জলশূন্য হয়ে যায় তখন কাদার ভেতর নেমে সবাই কাদায় আটকে পড়া মাছ তুলে নেয়। একদিন অ্যানি কাদায় নেমে মাছ ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে পোশাক-আশাক কাদায় মাখামাখি করে ফিরল লাইট হাউসে। এ্যাডাম বোনকে এ জন্যে সাবধান বা মৃদু ভর্ৎসনাও করল না। সে নিভৃতে চৌকিদার ভুবন ভক্তাকে কাছে ডেকে বলল, এ দেশের সবকিছু অ্যানির ভারী পছন্দ হয়ে গেছে। কিন্তু ও এ সব জায়গার হালচাল আর নদী-নালার খবর কিছুই জানে না। তুমি এমন একটা মেয়ে যোগাড় করে দাও যে অ্যানির সঙ্গে সব সময় থাকতে পারবে।

ভুবন ভক্তা খানিক চিন্তা করে বলল, চেষ্টা করে দেখব হুজুর।

এ্যাডাম বলল, চেষ্টা নয়, আমার কিন্তু জলদি চাই। অ্যানি ভীষণ কৌতূহলী। হঠাৎ কোন বিপদে না পড়ে যায়। আর তাছাড়া আমি যেমন তোমাদের দেশের ভাষা শিক্ষা করে নিয়েছি ও-ও তেমনি শিক্ষা করতে চায়। ওর মত বয়সের একটা বন্ধু হলে খুব উত্তম হয়।

ভুবন মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা হুজুর। 'ওর মত বয়েসের একটা বন্ধু'—কথাটা শোনামাত্রই ভুবনের চোখের ওপর একটা মুখ ভেসে উঠল।

দুপুরে খাবার পাট চুকলে ভুবন ছুটল চালতাতলার সেই নিষিদ্ধপল্লীর দিকে।

মাসী তখনও বের হয়নি জাহাজঘাটায় খদ্দেরের খোঁজে। চুল বেঁধে দিচ্ছিল সাগরের। ভুবন হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়ল।

মাসী দাওয়ায় চাটাই পেতে দিতে দিতে বলল, অবেলায় কি মনে করে বেয়াই?

ভুবনের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা না থাকলেও মাসী ভুবনকে বেয়াই বলেই ডাকত। মাসী মানদাসুন্দরী এ অঞ্চলের এক ডাকসাইটে নায়েবের রক্ষিতা ছিল। পশ্চিমে ঘর আর স্বামী ছিল মানদার। সুন্দরী বউকে আগলে রাখার শক্তি বা সামর্থ ছিল না মানদার স্বামীর। চাষাভুষো লোকটাকে বিঘে দুই জমি দিয়ে নায়েব তার সুন্দরী বউটাকে তুলে নিয়ে এসেছিল এই জালপাই মহলে। শেষে নায়েব যখন কঠিন রোগে পড়ল তখন তাকে প্রাণ দিয়ে সেবা করল মানদা। নায়েবও তার শেষ সময়ে মানদাকে লিখে পড়ে

দিল এ জায়গাটা। হুঁসিয়ার মানদা কিছু টাকা পয়সাও সরিয়েছিল। বাপের মারা যাবার পর সে দু-একখানা করে ঘর তুলল। জাহাজঘাটার কাছে তখন গড়ে উঠেছে সাহেবনগর। ব্যবসা বাণিজ্যে খাজুরীর তখন রমরমা অবস্থা। কত লোকজনের সে সময় নানা কাজে আসা যাওয়া। কলকাতা, হুগলীর যাত্রীরা দূর দেশ থেকে জাহাজে এসে ক'দিনের জন্যে বিশ্রাম নিত খাজুরীতে। বড় জাহাজ তখন গঙ্গার মোহনায় খাজুরীতেই নোঙর ফেলত। হুগলী নদী উজিয়ে কলকাতা যাবার পথ বিপজ্জনক ছিল। খাজুরী থেকে যাত্রীরা 'স্লুপ' নামের ছোট জাহাজে মালপত্র নিয়ে কলকাতা যেত। তাদের দেহ মনের বিনোদনের জন্য খাজুরীতে পতিতালয়ের প্রয়োজন দেখা দিল। মানদাসুন্দরী এই সুযোগটা কাজে লাগাল। বিধবা, গৃহত্যাগী, অন্নবস্ত্রহীন মেয়েদের যোগাড় করে এনে সে ব্যবসা ফাঁদল। মানদার বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার গুণে দিনে দিনে জমে উঠল ব্যবসা।

ভুবন এ্যাডাম সাহেবের ইচ্ছার কথাটা খোলাখুলি জানাল মানদাকে। বলল, সাগর এখন তোমার মেয়ে। তুমি তাকে বিপদে ঠাঁই দিয়েছ। তুমি এখন তাকে অনুমতি না দিলে আমার সাধ্য কি নিয়ে যাই।

অনেক ভাবল মানদা। মেয়েটাকে সত্যিই সে ভালবেসে ফেলেছিল। ওকে পাপ ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিলে অনেক অনেক টাকা সে কামাতে পারত, কিন্তু মেয়েটার গলায় প্রথম দিন রাধাকৃষ্ণের গান শুনে সে এমনই মোহিত হয়ে যায় যে তাকে আর পাপ কাজে লাগাতে প্রাণ চায়নি। মানদা আজকাল সাগরের গান শুনত আর ভাবত এই পাঁকের পুকুরে সাগরই তার একটি মাত্র পদ্ম, যে তাকে হয়তো একদিন ঠাকুরের চরণে যাবার পথ দেখাবে।

তবু যেতে দিতে হল সাগরকে বাপের সঙ্গে। নিজের মেয়ে হলেও ভুবন জোর জুলুম করল না, তার বিবেচনার ওপরই সবটা ছেড়ে দিল। এ অবস্থায় অনুমতি না দিয়ে কি পারা যায়। আর তাছাড়া সাহেব চেয়েছে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেয়।

যাবার সময় শুধু বলল, নিয়ে যাও, কিন্তু মাঝে মাঝে একটিবার করে দেখিয়ে নিয়ে যেও মেয়েটাকে। ও ছিল আমার পাপের গাঙে একমাত্র পারাণির কড়ি।

দুঃখী মেয়েগুলো সবাই এসে ভীড় করল সাগরের চারদিকে। আজ আর মাসী ওদের ধমক দিল না, সরে যেতেও বলল না। মাসী দুপুরে

জাহাজঘাটার দিকে চলে গেলে ওরা চুপি চুপি চলে আসত সাগরের পাশে। গান শুনত আর নিজেদের পাপ জীবনের কথা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। ওরা জানত, এ জীবন থেকে ওদের মুক্তি নেই। মাসী ছেড়ে দিলেও মুক্তি নেই, পালিয়ে গিয়েও নয়। পেটের জ্বালা যত দিন ততদিন জ্বলতে জ্বলতে এখানেই থাকতে হবে। একবার একটা মেয়ের দেহে কি খারাপ রোগ ঢুকেছিল। যন্ত্রণায় পাগলের মত কাতরাত। ভাল হল না তুকতাক, জড়িবুটিতে। শেষে মেয়েটা গাঙে ডুবে সব জ্বালা জুড়াল। যা হবার স্বপ্ন দেখে ওরা। বর্ষার দিনে অদূরে চাষের জমিতে চাষাভুষোরা কাজ করে। তালপাতার তৈরি 'পাখিয়া' মাথায় দিয়ে আসে চাষার বউ। পান্তাভাত নিয়ে আসে স্বামীর জন্যে। বায়নাদার ছেলে কথা শোনে না। বর্ষার জলে ভিজে মায়ের আঁচল ধরে আসে পিছন পিছন। কখনো চড়চাপড় খেয়ে তুমুল সোরগোল তুলে কাঁদে। আবার পরক্ষণেই মা তাকে বুকে জড়িয়ে আদর করে চুমু খায়—কুঁড়েঘরের ঝোর্‌কা দিয়ে অভাগী মেয়েরা এ সব ছবি দেখে আর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখ মুছে আবার পেটের জ্বালা ঘোচাবার কাজে লেগে যায়। তাদের কাছে এ ছবি একটা মিথ্যা স্বপ্ন বলেই মনে হয়। অথৈ সমুদ্রের মাঝে এক চিল্‌তে চর ছিল সাগর। ডুবে যেতে যেতেও চরটুকুকে অবলম্বন করে একটুখানি হাঁফ ছাড়ার সুযোগ পেত। এখন পায়ের তলার সব আশ্রয় সরে গেল। যতটুকু সময় লোনা জলে হাত পা ছুড়ে বাঁচা যায় এখন। তারপর অতলে মরা মাছের মত তলিয়ে যাওয়া।

॥ তিন ॥

সাগরকে মনে ধরেছে অ্যানির। শুধু মনে ধরা নয়, হাত ধরে ঘুরছে সকাল সন্ধ্যে। প্রায় একই বয়েস দুজনের। কেউ বোঝে না কারু ভাষা, তাতে কি এসে যায়। মনের কথা ঠিকই বোঝে সমবয়সী।

এতদিনে ভুবনের যেন পুরো দম এসেছে বুকের মধ্যে। শূন্যতাটা ভরাট হয়েছে মেয়েকে কাছটিতে পেয়ে। প্রথম রাতটি লাইটহাউসের নীচে চৌকিদারের ডেরায় কাটিয়েছিল সাগর। পরের রাত থেকে একেবারে অ্যানির ঘরে। অ্যানির শুধু দিনে নয়, রাতেও সাগরকে কাছে চাই। অনেক রাত অব্দি দুই ভিন্‌দেশী সখির গল্পগুজব চলে। দুজনের ভাষা ভিন্ন। কেউ কারু কথা বোঝে না। তবুও। অ্যানি হয়তো বলল, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

সাগর ইংরেজী ভাষার অর্থ না বুঝে উত্তর করল, আমি কক্ষনো এত উঁচুতে শুয়ে রাত কাটাইনি।

অ্যানি সাগরের শেষের কথাটাতে ইঁদুরের গন্ধ পেল। 'রাত' হয়ে গেল 'র‍্যাট'। অমনি বিছানার ওপর উঠে বসে ভীতু গলায় বলল, এখানে ইঁদুর আছে নাকি?

সাগরও ততক্ষণে উঠে বসেছে। জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছে চাঁদের আলো। সে বুঝতে পারল না অ্যানি কেন বিছানার ওপর উঠে বসল। তবে অ্যানির চোখে মুখে যে ভয়ের চিহ্ন তা চাঁদের আলোতেও দেখতে পেল।

সাগর অনুমান করল অ্যানি ভূতের ভয় পেয়েছে। সে অমনি হাত নেড়ে নেড়ে সাহস দিয়ে বলল, না না, ভূত নেই। ভূত থাকলে ঠিক বাবার চোখে পড়ে যেত।

সাগরের হাত নাড়া দেখে অ্যানি কিছুটা আশ্বস্ত হল। তার ঘরে যে ইঁদুর ঢুকে পড়েনি এটা সে বুঝতে পারল। সে তখন জানালার ধারে গিয়ে নিচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, তাহলে কি ঐ নিচে আছে?

এবার সাগর ভাবল জালপাই-এর জঙ্গলে ভূত আছে কিনা তা জানতে চাইছে অ্যানি। সে অমনি মাথা নেড়ে জানাল, ওখানে ভূত থাকলেও থাকতে পারে।

এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে অ্যানি শুয়ে পড়ল বিছানায়।

অ্যানি বাংলা শেখে, সাগর শেখায়। কড়া, খুন্তি, সাগর, নদী, বন, পথ বিছানা, হাসি-কান্না শেখা চলল, কিন্তু আসল শেখা হবে কি করে? অর্থবোধক বাক্য শেখানোই দায় হল। সাগর ইংরেজী জানে না।

অ্যানিকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো তার দাদা এ্যাডাম। তিন বছরের চাকরি জীবনে এ্যাডাম দুর্দান্ত বাংলা শিখেছে। প্রথম দিকে সাহেবনগরে গিয়ে অনেক পুরোনো অভিজ্ঞ সাহেবদের কাছ থেকে। তারপর নিজের শেখার প্রচণ্ড তাগিদেই সে এদেশী মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। শিখে গেছে বহু শব্দ, বহু কথা। অনর্গল কথা চালিয়ে যেতে তার একটুও বাধে না আর। সেই হল এখন অ্যানির আসল শিক্ষক। অ্যানি যেমন কৌতূহলী তেমনই গভীর। শেখার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। সে খুব কম দিনের ভেতরেই অনেক কিছু আয়ত্ত করে ফেলল। এখন পথে-ঘাটে সাগরের সঙ্গে চলতে ফিরতে সে এ দেশের ভাষাতেই কথা বলতে লাগল।

গেলেই বড় আর একটা মাঠ। মাঠের শেষেই বন্দর এলাকা।

জালপাই-এর জঙ্গলে ঢোকার আগে সাগর দেখল বেশ খানিকটা দূরে উড়ুনী গায়ে সেই লোকটা তার পিছন পিছন আসছে। বন্দরের হিন্দু কর্মচারী আর ডাক-নৌকোর মাঝি-মাল্লারা হপ্তা দুয়েক আগে গঙ্গাপূজার বাড়িতে একটা মানসিক পূজার আয়োজন করেছিল। সেই পূজা বাড়িতে মাসীর অনুরোধে আর ব্যবস্থায় কীর্তন গাইতে গিয়েছিল সাগর। গান গাইতে গাইতে চোখাচোখি হয়েছিল একটা মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে। ভীড়ের ভেতর থেকে বকের মত গলা উঁচিয়ে লোকটা দেখছিল তাকে। মনে হয়েছিল যেন লোকটাকে কোথায় দেখেছে একবার। তারপর যতবারই সে শ্রোতাদের দিকে চেয়েছে ততবারই লোকটাকে মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে দেখেছে। তার গায়ে ছিল একটা উড়ুনী। গান ভাঙার সময়ও ভীড়ের ভেতর চোখে পড়েছে। পরে যখনই সে মাঠ পেরিয়ে বাতিঘর অথবা মাসীর বাড়ি যাওয়া-আসা করেছে তখনই ঐ রকম একটা উড়ুনীধারীকে তার পিছু নিতে দেখেছে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সাগর ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভেতর। ঝাঁকড়া একটা তেঁতুলগাছের আড়ালে সে লোকটার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ফিরে দাঁড়াল। লোকটা হাত তুলে জঙ্গলের দিকে কাকে কি যেন দেখাচ্ছিল। হঠাৎ সাগর অনুভব করল পিছন থেকে তার মুখে দুটো হাত এসে পড়েছে। কি কঠিন সে হাতের বাঁধন। তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই তাকে মাটিতে ফেলে পুরু কাপড় দিয়ে মুখ আর হাত দুটো বেঁধে ফেলা হল। মনে হল এবার দু-তিনটে লোক তাকে শূন্যে তুলে ধরেছে। এরপর কোথা থেকে এগিয়ে এলো একটা পাল্কী। সেই পাল্কীর ভেতর তাকে ঢোকানো হল। তারপর নিঃশব্দে পাল্কীটি এগিয়ে চলল জালপাই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে।

পাল্কীর ভেতরে থেকে নৌকোর দোলায় দুলছে সাগর। মনে হচ্ছে তীর থেকে বেশী দূরে নৌকো নেই। কারণ তীরে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পাচ্ছে সে। আকাশে চাঁদ নেই। পাল্কীর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুধু অন্ধকার। দু-একটা তারা চোখে পড়ছে দুলুনির ফাঁকে ফাঁকে।

কতক্ষণ এমনি চলতে চলতে এক সময় কোথায় যেন এসে ভিড়ল নৌকো। অন্ধকারে নৌকো থেকে পাল্কী তোলা হল ডাঙায়। সে পাল্কী এগিয়ে চলল ঘাট-মাঠ ভেঙে। এক সময় পাল্কী নামল। কোথায়, ভাগ্যের

কোন্ কূলে এসে পড়েছে সে কিছুই বুঝতে পারল না। পাল্কী থেকে তাকে নামিয়ে খুলে দেওয়া হল বাঁধন। ততক্ষণে চাঁদ উঠেছে। আবছা আলোর সব-কিছু রহস্যময়। ছায়ার মত একটি মানুষ এগিয়ে এসে একটুখানি দূরে দাঁড়িয়ে বলল, কি গো বৈষ্ণবী, চিনতে পারো ?

গলাটা কানে যাওয়া মাত্রই একটা নিশির ডাক শোনার মত হিম হয়ে গেল সাগরের রক্ত।

মেহেদীনগরে শিবরাত্রি উপলক্ষে ৺ভীমেশ্বর মহাদেবের মন্দির সংলগ্ন প্রান্তরে মেলা বসেছে। মেলার শেষ দিনে জমিদার হরশঙ্করের ব্যবস্থাপনায় এ বছর একটি নতুন বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। এটি ঘোড়দৌড়ের অনুষ্ঠান। বিভিন্ন গ্রামের হাটে ঢোল সহরৎ মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে কোন লোক ঘোড়দৌড়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি সাহেবের হাত থেকে উপযুক্ত পুরস্কার পাবে। এই পুরস্কারের আর্থিক দায়িত্ব বহন করবেন মেহেদীনগরের জমিদার হরশঙ্কর নায়েক।

হরশঙ্করের এ আয়োজনের পিছনে কিছু উদ্দেশ্য আছে। হরশঙ্করের বাবা চন্দ্রচূড় নায়েক ছিলেন এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় লবণের কারবারী। হিজলীর প্রায় তিনভাগ খালাড়ীর মালিক ছিলেন তিনি। উত্তরাধিকারসূত্রে হরশঙ্কর বাবার মস্ত বড় জমিদারীর মালিক হন কিন্তু কোম্পানির আইন অনুযায়ী খালাড়ীর বিপুল আয় থেকে তিনি বঞ্চিত হন। ১৭১৮ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সল্ট ডিপার্টমেন্টের প্রতিষ্ঠা করে। জমিদারদের হাত থেকে লবণ প্রস্তুতের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। প্রথম দিকে অবশ্য লবণ প্রস্তুতের কাজে কোম্পানিকে সাহায্যদান বাবদ জমিদারদের উৎপন্ন লবণের পরিমাণ অনুযায়ী একটি মাসোহারা দেওয়া হত। পরে নানা অসুবিধা দেখা দিলে ১৭৯৪ খৃস্টাব্দে জমিদারদের হাত থেকে কোম্পানি সমস্ত খালাড়ীর বন্দোবস্ত নিয়ে নেয়। এর পরিবর্তে জমিদারদের একটি বাৎসরিক জমা ধার্য হয়।

কোম্পানির নিমক-বিভাগ প্রতিষ্ঠা হলে তমলুক আর হিজলীতে সল্ট এজেন্ট হয়ে এলেন যথাক্রমে আর্কডেকন ও টমাস কালভার্ট।

হিজলীতে কালভার্ট সাহেবের কার্যকাল শেষ হবার পরে একাধিক সল্ট এজেন্ট এসেছেন। তাঁরা কেবল সরকারের লবণ ব্যবসার কাজই দেখতেন না, ছোটখাট ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারও করতেন।

জমিদারদের জমিদারীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাপী লেগেই থাকত। সেজন্যে জমিদারদের সল্ট এজেন্টের লোকজনদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে হত। অধঃস্তন কর্মচারীদের উৎকোচ দানে বশীভূত করলেও উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের জন্য অন্য ব্যবস্থা রেখেছিলেন। হরশঙ্কর জানতেন, মানুষ কামনা বাসনার বশ। অবিবাহিত অথবা দেশে বউ রেখে আসা ইংরাজ কর্মচারীরা দৈহিক ক্ষুধায় স্বাভাবিক ভাবেই পীড়িত হয়। তাদের দৈহিক তৃপ্তির জন্য তিনি তাঁর সুসজ্জিত বাগানবাড়িতে পান-ভোজনের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মনোহারী রমণী রত্নেরও ব্যবস্থা রাখতেন।

ইদানিং মেলায় ঘোড়দৌড় প্রবর্তনের প্রধান কারণ, ইংরাজদের বিচারকের ভূমিকায় টেনে আনা এবং তার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন। সম্প্রতি একটি বিশেষ কার্যোদ্ধারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে হরশঙ্করের। তিনি মনস্থ করেছেন হিজলী-খালাড়ীর সমস্ত লবণের জল-স্থল পরিবহণের ভার তিনি একাই গ্রহণ করবেন। হরশঙ্কর খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, এ কাজটুকু দেবার ক্ষমতা যদিও সল্ট এজেন্ট সাহেবের তবু কাজ দেবার আসল মালিক হিউম সাহেব। হিউমের তৈরি করে দেওয়া কাগজপত্রে সল্ট এজেন্ট চোখ না বুলিয়ে সই করে যান মাত্র।

হিউম সাহেব সম্বন্ধেও মোটামুটি খোঁজখবর নেওয়া হয়ে গেছে হরশঙ্করের। পত্নী দীর্ঘকাল কাছে নেই। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াত—সে মেয়েটিকেও আর দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং ক্ষুধার্ত হিউমের কাছে রসদ যোগাতে পারলেই কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে।

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় হিউমকে বিচারক করে আনা হয়েছে। শত শত দর্শকে পূর্ণ প্রান্তরে উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলল প্রায় দিবা অবসান পর্যন্ত। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণও চলল বেশ কিছু সময়। এরপর অন্ধকার রাত্রি। হিউম সাহেব অনুরুদ্ধ হল হরশঙ্করের সুসজ্জিত বাগানবাড়িতে রাত্রি যাপনের জন্য। আপত্তির কোন কারণ ছিল না হিউমের। কোন কোন দিন হাতের কাজ বেশী থাকলে সাহেবনগরে ফিরে না গিয়ে হিজলীর অফিসেই রাত্রিবাস করত হিউম।

হিউমকে হরশঙ্কর সসম্মানে নিয়ে গেলেন তাঁর বাগানবাড়িতে। হরশঙ্করের আচরণে খুশী হয়েছিল হিউম, এবার জমিদারের আপ্যায়নে বিশেষ তৃপ্তিবোধ করতে লাগল।

মহা আড়ম্বরে সান্ধ্যভোজ শেষ হলে একে একে বিদায় নিলেন হরশঙ্-

রের নির্বাচিত গণ্যমান্য অতিথিরা। শুধু ঘরের মধ্যে রইলেন হরশঙ্কর আর হিউম সাহেব।

হরশঙ্কর অতি বিনয়ের সঙ্গে যুক্তকরে সাহেবের কৃপাভিক্ষা করলেন।

হিউম খুশীই ছিল হরশঙ্করের ওপর, তবুও বলল, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, একটু ভেবে দেখতে হবে। গোপীচক থেকেও এ ধরনের একটি আবেদন এসেছে।

প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড় হরশঙ্করের।

তাঁর এত দিনের এত কিছু পরিকল্পনা বুঝি ভেস্তে যায়। সেই চির প্রতিদ্বন্দ্বী কালিচরণ মহাপাত্রের এ কাজ। লোকটা কি পদে পদে তাকে বাগড়া দিতে জন্মেছে? হরশঙ্করের মনে হল, বাগে পেলে সে ঐ কালিচরণের মাথাটা আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।

হরশঙ্করের তূণীরে শেষ অস্ত্র তৈরি ছিল। মাঝ রাতে সাহেবের শয়নকক্ষে সুন্দরী নারীর হাত দিয়ে দামী মদ পরিবেশন। হরশঙ্কর জানতেন, সাহেবদের দুটি গুণ আছে। একটি খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই, অন্যটি মহাভারত পাঠ না করার জন্য ভীষ্মের জিতেন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে অনুশীলন করার কোন আগ্রহ নেই।

বেশ খানিক রাতে সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় হরশঙ্কর বললেন, হুজুর, আরও কিছু দামী মদ অধীনের সংগ্রহে আছে। আমি তা পাঠিয়ে দিচ্ছি। হুজুর সেবা করলে অধম কৃতার্থ হবে।

হিউমের শয়নকক্ষে বিলিতি মোমের বাতি জ্বালানো হয়েছে। হিউম সমানে মদ্যপান করে চলেছে। হঠাৎ পিছনের দরজায় ভীরু একটা পদধ্বনি শোনা গেল। এ দেশীয় কোন মেয়ের পায়ের সাড়া বলে মনে হল হিউমের। রূপোর তৈরি মলের আওয়াজ। মেয়েটি বড় সংকোচে একটি পা এগিয়েই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে!

হিউম যথেষ্ট পান করলেও নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলে না। অ্যানির মৃত্যুর পরে সে অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত পানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখত। কিন্তু আজকের অবস্থা তার তেমন ছিল না। অনেক দিনের চাপা একটা বিষণ্ণতা সারাদিনের আনন্দ অনুষ্ঠানের উত্তেজনায় অনেকখানি কেটে গিয়েছিল।

হিউম উঠে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকাল। সেজের বাতি জ্বলছে।

কে ওখানে! কে?—হিউমের গলায় চূড়ান্ত বিস্ময়।

মুখে আঙুল দিয়ে মেয়েটি কথা বলতে বারণ করল হিউমকে। সেও তখন বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

দরজা বন্ধ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো মেয়েটি। হিউমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, আপনি হিউম সাহেব!

তুমি এখানে সাগর! আর আমরা তোমাকে সারা দুনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছি।

এ্যাডাম সাহেব কেমন আছেন?

তোমার ভাবনায় অস্থির। অ্যানি মারা যাওয়ায় বেচারা যতখানি দুঃখ পেয়েছে, তোমাকে হঠাৎ হারিয়ে তার চেয়ে কম দুঃখ পায়নি।

সাগর বলল, এ্যাডাম সাহেবকে বলবেন, সাগরও বেঁচে নেই।

হিউম বলল, এই তো জলজ্যান্ত বেঁচে আছ।

দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল সাগরের।

কাঁদছ কেন সাগর? আমি তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব। কিন্তু আগে বল কি করে এখানে এলে?

সাগর তখন হরশঙ্করের সঙ্গে তার কণ্ঠীবদলের কাহিনী থেকে শুরু করে শেষে তাকে মুখ বেঁধে ধরে আনা পর্যন্ত সব ঘটনাই একের পর এক বলে গেল।

অবশেষে সারারাত দুজনের পরামর্শে স্থির হল, জোর-জুলুম নয় কৌশলে হরশঙ্করের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। সাগরের ক্ষেত্রে প্রথম অসুবিধে সে কণ্ঠীবদলের ফলে একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। জোর করে নিয়ে যেতে গেলেই হরশঙ্কর আইনের আশ্রয় নেবে। সম্প্রতি জালপাই জঙ্গল জমিদারের হাত থেকে আইন করে কেড়ে নিয়েছে সরকার। সেদিক থেকে কিছু কিছু অসন্তোষ জমা হয়েছে। আবার একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে যেতে গেলে সরকারী আদালত সঙ্গত কারণেই সমর্থন জানাবেনা। হয়তো এই মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার নিয়ে জমিদাররা একসঙ্গে লড়তে পারে। তাই কৌশলের আশ্রয় নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হল হিউম সাহেবের।

ভোরবেলা সাহেবের খোঁজ নিতে এলেন হরশঙ্কর। বুক দুরু দুরু। কার্যোদ্ধার হবে তো? মেয়েটা না জানি সাহেবের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছে।

হিউম বসে ছিল বারান্দায়। হাত জোড় করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন

হরশঙ্কর। হুজুরের বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত হয়নি তো ?

হিউম মৃদু হেসে বলল, না। আর কাল যে মেয়েটিকে পাঠিয়েছিলেন, সেটি বেশ খাসা মেয়ে।

আপনার মনোমত সেবা করতে পেরেছে হুজুর ?

হ্যাঁ, মেয়েটি খুব কাজেরও। এমন একটি মেয়ের সন্ধান পেলে জানাবেন তো। আমার বড় দরকার এমন একটি কাজের মেয়ের।

মুহূর্তকাল ভেবে নিলেন হরশঙ্কর। এমন অনেক মেয়ে যোগাড় হয়েছে, হবেও আবার। কিন্তু এমন সুযোগটি আর আসবে না। তাছাড়া এই সাগর মেয়েটা ভীষণ ঢ্যাটা। সহজে বাগ মানানো যায় না। ওকে দান ফেলে যদি বাজিটা জিতে নিতে পারে তাহলে আখেরে লাভ।

হরশঙ্কর বিনয়ে গদগদ হয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, হুজুর কি সৌভাগ্য আমার যে নিজমুখে কথাটা বললেন! আপনি যদি কৃপা করে কাল রাতের ঐ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যান তাহলে আমি কৃতার্থ হই।

হিউম দেখল, সামান্য একটি কথাতেই কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। কিন্তু এখনও একটি কাজ করিয়ে নেওয়া বাকী। এ সব ধুরন্ধর জমিদারগুলোকে বিশ্বাস নেই।

হিউম বলল, বেশ, আপনার ঐ মেয়েটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু একটি ছাড়পত্র না দিলে তো সঙ্গে নেওয়া যাবে না।

সে আর এমন কথা কি হুজুর, আমি এখুনি দিয়ে দিচ্ছি।

হ্যাঁ, আর এক কথা, আপনি আগামী কাল আমার অফিস থেকে লবণ পরিবহনের অনুমতি পত্রটা নিয়ে আসবেন।

মাথা নীচু করে ভূমিষ্ঠ হলেন হরশঙ্কর নায়েক। —হুজুরের কৃপা, হুজুরের কৃপা—বলতে বলতে সাগরের ছাড়পত্র রচনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

।। ছয় ।।

সাহেবনগরের শেষপ্রান্তে এ্যাডাম সাহেবের ছবির মত বাংলো বাড়ি। বিরাট কম্পাউণ্ড নারকেল গাছ দিয়ে ঘেরা। শুক্লাচতুর্দশীর জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। পাশাপাশি বসে আছে এ্যাডাম আর সাগর। নারকেল গাছের সবুজ ঝালর থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার জল। অদূরে দেখা যাচ্ছে দিগন্তে মিশে যাওয়া মোহনার একফালি নীল।

কিছুক্ষণ আগে গল্পসল্প করে চলে গেছে হিউম। সাগর জোর করে তাকে খাইয়ে দিয়েছে রাতের খাবার। প্রায়ই সে তাই করে। অ্যানি মারা যাবার পর হিউম বড বেশি ড্রিঙ্ক করত, এখন সাগরের অনুরোধে অনেকখানি সংযত হয়েছে সে। সন্ধ্যায় একা একা নিজের কোয়ার্টারে কাটাত, এখন এ্যাডাম বাড়ি করে চলে আসার পর সন্ধ্যেটা দু'বন্ধুর একসঙ্গে কাটে।

সাগরকে ফিরে পাবার পরই এ্যাডাম তাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে করেছে। তারপর এখানে থেকেই দেশের ঘর-বাড়ি জমি জায়গা বিক্রির ব্যবস্থা করে টাকা এনেছে। সেই টাকায় কিনেছে বিরাট এক বাগান। তার ভেতর তৈরি হয়েছে সুন্দর একটা বাংলো বাড়ি। লাইটহাউসের কাজ ছেড়ে এখন এ্যাডাম খাজুরী বন্দরে পোর্ট অফিসের কাজে যোগ দিয়েছে। বাড়ী থেকে বেশী দূর যেতে হয় না, বেশ কাছেই অফিস। দেশে থাকতে এ্যাডাম ইতিহাসের ছাত্র ছিল। এখানে কাজের ভেতর পড়ে ইতিহাস চর্চায় ইতি ঘটেছিল। এখন আবার মাথায় সে বিদ্যেটা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অবসর সময়ে এ্যাডাম হিজলী আর খাজুরী অঞ্চলের নথিপত্র ঘেঁটে ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করে। মাঝে মাঝে সে আর হিউম তথ্যের খোঁজে ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ঘরের কাজ করে সাগর। এ দেশের মেয়ের মতই তার পোশাক পরিচ্ছদ, আচার আচরণ। এ্যাডামের এতে পূর্ণ সমর্থন। লালপাড ডুরে শাড়ি, মাথায় সিঁদুরের টিপ, হাতে শাঁখা পরে সাগর যখন সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায় তখন এ্যাডাম অপলক চোখে চেয়ে চেয়ে সাগরকে দেখে।

রাত হলে সাগরের মুখে গান শুনতে চায় এ্যাডাম। রাধাকৃষ্ণের গান। এ গানে এখন প্রচুর রসের সন্ধান পেয়েছে সে।

সাগর একদিন একটা ধুতি আর উড়ুনি এনে বলল, আজ এই পোশাক পর তো ঠাকুর।

এ্যাডাম অমনি বলল, এ আবার তোমার কি খেয়ালের খেলা রাধারাণী?

মাঝে মাঝে দুজনের গানের আসরে এ্যাডাম সাগরকে 'রাধারাণী' আর সাগর এ্যাডামকে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করে।

এ্যাডাম ধুতি পরতে জানে না। সাগর তাকে কেমন করে ধুতি পরতে হয় তা দেখিয়ে দিল। এ্যাডাম ধুতি পরে বসল একটা মাদুরে। সাগর তার গায়ে জড়িয়ে দিলে ধবধবে উড়ুনি। তারপর একটা ছোট্ট বাটিতে চন্দন ঘষে এনে এ্যাডামের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিল। বাগান

থেকে তুলে আনা সাদা টগরের একটা মালা গেঁথে রেখেছিল সাগর, তাই পরিয়ে দিল এ্যাডামের গলায়। শেষে গড হয়ে প্রণাম করে বলল, এবার আমার প্রাণের ঠাকুরকে আমি গান শোনাব।

এ্যাডাম নতুন সাজে সেজে মোহগ্রস্তের মত বসে রইল।

সাগর প্রাণ ভরে গান শোনাল এ্যাডামকে।

সেই প্রথম কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গিয়েছেন। শুধু একটি মানুষই নেই তবু মনে হচ্ছে সারা বৃন্দাবন নগরীটাই শূন্য হয়ে গেছে। শূন্য হয়ে গেছে যমুনার তীর, শূন্য হয়ে গেছে কুঞ্জভূমি আর শূন্য হয়ে গেছে শ্রীমতী রাধার অন্তর। রাধা আক্ষেপ করে বলছেন,—

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনী।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক কু-দিন দিবস দুই-চারি॥

মধুপুরে হরি চলে গেলেন, আর আমি কুলবালা পথের ওপর ফেলে দেওয়া মালতী মালার মত পড়ে রইলাম। ওগো সখি, কেমন করে কাটাব আমি হরি বিহীন দিন আর হরি বিহীন রাত্রি। আমার চোখের ঘুম গেছে, আমার মুখের হাসি গেছে। সব সুখ চলে গেছে প্রিয়তমের সঙ্গে আর দুঃখ শুধু রয়ে গেছে আমার পাশে।

এমনি গানে গানে রাধার আক্ষেপ ছড়িয়ে দিল সাগর সন্ধ্যার আকাশে। মন্ত্র-মুগ্ধের মত সে গান শুনল এ্যাডাম। শেষে নিবেদনের একটি পদ গাইল সাগর—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
... ...
পিরীতি-রসেতে ঢালি তনুমন
দিয়াছি তোমার পায়।

তুমি মোর পতি   তুমি মোর গতি

মনে নাহি আন ভায় ॥

গান শেষ হলে স্বামীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল সাগর। ঘর থেকে গোবিন্দ পূজার প্রসাদ এনে রেকাবিতে করে সাজিয়ে খেতে দিলে এ্যাডামকে। এ্যাডাম খেতে লাগল আর পাশে বসে তার খাওয়া দেখতে লাগল সাগর।

আজকাল তিল আর নারকেলের নাড়ুতে বড় স্বাদ পেয়ে গেছে সাহেব। সন্ধ্যায় যখন রাধামাধবের মূর্তির সামনে ভোগ নিবেদন করে সাগর পূজা শেষের ঘন্টা নাড়ে তখন এ্যাডাম প্রতীক্ষা করে থাকে ঐ দুটি উপাদেয় বস্তুর জন্য। সাগরের হাতে প্রসাদের রেকাবী দেখলেই খুশীতে ভরে ওঠে এ্যাডামের মন।

আজ ধুতি পরে প্রসাদ খেতে খেতে এ্যাডাম বলল, তুমি যদি আমাকে তোমার প্রাণের ঠাকুর ভেবে গান শোনাও তাহলে তুমি পীত বসন না পরিয়ে আমাকে সাদা ধুতি পরালে কেন?

কথা শুনে হেসে উঠল সাগর। বলল, ও এই কথা। তুমি তো কৃষ্ণের মত কালো নও, তুমি আমার গৌর ঠাকুর। তাই পীতবাস না পরিয়ে শুভ্র বসন পরিয়েছি।

এমন সময় বাইরে গলা শোনা গেল হিউমের। সাগর বলল, চটপট পোশাক ছেড়ে বাইরে যাও।

এ্যাডাম বলল, পোশাক ছাড়ব কেন রাধারাণী, এই তো আমি আসল পোশাক পরেছি।

ধুতি পরেই চলে গেল এ্যাডাম হিউম সাহেবের কাছে।

হিউম তো অবাক। বলল, বেশ মানিয়েছে তোমাকে কিন্তু। সাগরকে বল, আমারও এমনি একখানা পোশাক চাই।

এ্যাডামের প্রশ্ন, এ নিয়ে তুমি কি করবে?

ভয় নেই, ও পোশাক পরে আমি অফিস যাব না। কোয়ার্টারে থাকার সময় পরব। গরমের দেশের পক্ষে বেশ উপযোগী পোশাক। সহজে হাওয়া চলাচল করতে পারবে।

হিউম সাহেবকে কিন্তু নাড়ুতে আগ্রহী করে তুলতে পারল না সাগর। অবশ্য তালের ফুলুরীতে আবার হিউমের ছিল প্রবল আকর্ষণ। ভাদ্র, আশ্বিনে প্রায় প্রতিদিন সাগরের কাছে খোঁজ নিত হিউম কবে তালের ফুলুরী

তৈরি হচ্ছে।

এ্যাডাম তার ডায়েরীতে লিখছে—ছোট্ট দুটি দ্বীপ পাশাপাশি জেগে উঠেছিল একদিন ভাগীরথীর পলিমাটিতে। এক সময় যে সাগর বইত তাম্রলিপ্তির পাশ দিয়ে সে এখন সরে এসেছে খাজুরী আর হিজলীর সন্নিকটে। মনে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে খাজুরী জেগে উঠেছিল জলের ওপর। ডি ব্যারোজের (১৫৫৩) মানচিত্রে আমরা খাজুরী আর হিজলী দ্বীপ দুটিকে চিহ্নিত দেখতে পাই।

হিজলী নগরীতে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ আছে। হিজলী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা নামে এক আফগান এই মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের সেবকদের কাছে রাখা কাগজপত্র ঘেঁটে সম্প্রতি হিজলীর কালেক্টর ক্রোমেলিন সাহেব এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দের ভেতর তাজ খাঁ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাজখাঁ মসনদ-ই আলার বংশধরদের রাজত্বের অবসান হয়। এ সময় খাজুরী আর হিজলী দ্বীপ দুটি পোর্তুগীজ আর মগ জলদস্যুদের লুণ্ঠনের জায়গা হয়ে ওঠে। তারা অর্থ, নারী, পুরুষ সবই হরণ করে নিয়ে যেত। আতঙ্কিত মানুষেরা সমুদ্রতীরের এই সকল উপদ্রুত জায়গা ছেড়ে দেশের অনেক অভ্যন্তরে চলে যায়। হিরোণ আর রেণেলের মানচিত্রে এ সব জায়গার দীর্ঘ অরণ্য অঙ্কিত হয়ে আছে। ওলন্দাজ লেখক স্কাউটেনের লেখাতেও এর সমর্থন পাচ্ছি। তিনি লিখেছেন, 'আমরা ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী জলেশ্বর নদী (সম্ভবত সুবর্ণরেখা) বামে রেখে গঙ্গার মোহনার অভিমুখে যাচ্ছিলাম। এখানে স্থলভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। এ সমস্ত অরণ্য ছিল সর্প, গণ্ডার, বন্য মহিষ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণীতে পরিপূর্ণ।'

১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিল্টন সাহেব তাঁর Account of the East Indies গ্রন্থে লিখেছেন. 'খাজুরী দ্বীপে মৎস্যজীবিদের বাস। এখানে প্রচুর পোষা শূকর অতি স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। অতি বৃহদাকার একুশটি শূকর আমি সতেরো টাকা মূল্যে ক্রয় করেছিলাম।'

আগে বড় বড় জাহাজ দেশ বিদেশ থেকে এসে নোঙর ফেলত বালেশ্বরে। সেখানে মালপত্র খালাস করে ক্ষুদ্র জাহাজ ও নৌকোয় পাঠিয়ে দেওয়া হত হুগলী নদী পথে কলকাতায়। গঙ্গার মোহনায় চর বহুলতার জন্য বড়

জাহাজ প্রবেশ করতে পারত না।

১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন জেমস 'রেবেকা' জাহাজটিকে পথ প্রদর্শক নাবিকের সাহায্যে ভাগীরথী পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। নদীর স্রোত অনুকূল হওয়ায় বালেশ্বরে না দাঁড়িয়ে বড় বড় জাহাজ একেবারে এসে নোঙর করতে লাগল হিজলী বন্দরে। পরে খাজুরীও বন্দর আর ব্যবসা-কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

হিজলী জিলাভুক্ত খাজুরী ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানী গ্রহণের সময় বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

কিছুকালের ভেতরেই পরিত্যক্ত জনপদটি কোলাহল মুখর নগরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যস্থল হয়ে দাঁড়াল খাজুরী।

এরপর ডায়েরীর পাতায় লিখল এ্যাডাম—খাজুরীর ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করছে নদীখাত পরিবর্তনের ওপর। এখন নতুন পোতাশ্রয় গড়ে উঠেছে সাগর দ্বীপের কাছে। বড় বড় জাহাজ গিয়ে নোঙর করছে সেখানে। খাজুরী থেকে নতুন পোতাশ্রয়ে গিয়ে চিঠিপত্র নিয়ে আসা নৌকোগুলোর পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠেছে। এখন সরাসরি কলকাতার জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলছে নতুন পোতাশ্রয়ের সঙ্গে। খাজুরী বন্দরের পক্ষে এটি শুভলক্ষণ নয়।

সাগর এসে এ্যাডামকে প্রশ্ন করে, কি অত লিখছ সাহেব ঠাকুর?

হাল্কা মনে থাকলে সাগর ঐ নামেই এ্যাডামকে সম্বোধন করে।

এ্যাডাম বলল, তোমার দেশের কথা।

সে কি গো ঠাকুর, এ বুঝি তোমার দেশ নয়!

হেসে বলল এ্যাডাম, এখন তা অবশ্য বলা যায়।

কি লেখন লিখছিলে?

খাজুরীর ভাগ্যলিপি।

সে আবার কি?

এ্যাডাম নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, একদিন সমুদ্রের তলা থেকে ঘুমন্ত দ্বীপটা জেগে উঠে সূর্যের আলোয় উত্তপ্ত হয়েছিল। তার বুকে জেগে উঠেছিল সবুজ অরণ্য। ধীরে ধীরে মানুষ এসে বসতি স্থাপন করেছে। গড়ে উঠেছে রাজ্য, বন্দর, ব্যবসা-কেন্দ্র। এখন খাজুরী পূর্ণযৌবনা সুরম্য নগরী। কিন্তু এই সৌভাগ্য তো চিরদিনের নয়।

কেন ঠাকুর?

যৌবনের জোয়ারের পরে ভাঙনের একটা ভাটা আসে। এটা শুধু মানুষের দেহেই নয় প্রকৃতির দেহেও দেখা যায়।

একটু বুঝিয়ে বল, আমি ঠিক ধরতে পারছি না।

নদীর স্রোত এখন অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে। তাই অনেকের আশঙ্কা কয়েক বছরের ভেতর খাজুরী বন্দরের আর এমন অবস্থা থাকবে না। একদিন হয়তো এটি একটি পরিত্যক্ত নগরী হয়ে দাঁড়াবে।

তুমি কেন এমন অলুক্ষুণে কথা বলছ ঠাকুর?

সত্য যা, তা অলুক্ষুণে হলেও সত্য। তোমার দেশের গণকঠাকুররা তাগা তাবিজ বেঁধেও তাকে পাল্টে দিতে পারবে না।

সাগর বলল, আবার তুমি এ দেশটাকে শুধু আমার দেশ বলছ?

ভুল হয়েছে রাধারাণী।

শাস্তি পেতে হবে।

এ্যাডাম হাত পেতে বলল, কি শাস্তি দেবে দাও।

সাগর হেসে বলল, সন্ধ্যায় এমনি করে হাত পাতলেও আর প্রসাদী নাড়ু পাবে না।

এ্যাডাম মিনতির সুরে বলল, এত বড শাস্তি দিও না রাধারাণী।

দ্রুত এগিয়ে এলো পরিবর্তন। ১৮০৭ আর ১৮২৩ সালের ঝড বিধ্বস্ত করে দিয়ে গিয়েছিল খাজুরী বন্দর কিন্তু বন্দর কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় অল্পকালের ভেতরেই তার ক্ষত কিছুটা নিরাময় হয়েছিল।

এবার দ্রুত নদীপথের পরিবর্তন ঘটল। ভাগীরথীর অপর পারে ডায়মণ্ড-হারবারে গড়ে উঠল নতুন বন্দর। বহু ইউরোপীয়ান খাজুরী ছেড়ে চলে গেল নতুন বন্দরে কাজ নিয়ে। কেউ বা চলে গেল কলকাতায়।

শ্রীহীন সাহেবনগর। তবু পোস্ট অফিসের কাজ চলে। লাইটহাউসে নিত্য বাতি জ্বলে। পোর্ট থেকে চাল, নুন, কাপড বড় বড় নৌকোয় বোঝাই হয়ে নতুন বন্দরের দিকে চলে যায়। সেখানে অপেক্ষমান জাহাজে মাল তোলা হয়।

কলকাতা বন্দর-অফিসে প্রমোশন পেয়ে চলে যেতে হল হিউম সাহেবকে। যাবার আগের রাতে এ্যাডাম, হিউম আর সাগর ঢুকল খাজুরী সমাধিক্ষেত্রে। জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছিল সমাধি স্তম্ভগুলির ওপর। সমুদ্র থেকে বয়ে আসা বাতাসে সমাধিক্ষেত্রের গাছের ফুল আর পাতা কাঁপছিল।

ছড়িয়ে পড়ছিল ফুলের গন্ধ।

অ্যানির সমাধি স্তম্ভের পাশে এসে ওরা দাঁড়াল। হিউম শুনতে পেল অ্যানি তার কানে কানে বলছে, এত দিনে আমাকে ছেড়ে চললে হিউম? মনে পড়বে কি তোমার, সেই যে আমরা ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্র তীর ধরে কত দূর চলে যেতাম?

মনে মনে বলল হিউম, তুমি আমার অন্তরে রয়েছ অ্যানি। যেখানে আমি যাব সেখানেই তুমি থাকবে। আমাদের প্রতিটি মুহূর্তের খেলা স্মৃতি হয়ে আছে আমার মনের গভীরে।

এ্যাডাম শুনতে পেল অ্যানি বলছে, আমি খুব খুশী হয়েছি এ্যাডাম, তুমি সাগরকে গ্রহণ করেছ। আমাদেব সাগরের ভেতর যে রত্ন আছে তা নেই তোমার ঐ সামনের সাগরে। তুমি কোন দিন ওর অমর্যাদা কোরো না এ্যাডাম।

এ্যাডাম মনে মনে বলল, সোনা বোনটি তুমি যা বলছ সবই সত্যি। সাগরের কোন তুলনা নেই। সারা জীবন ও আমার ভালবাসা পাবে। তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর।

সাগর দেখল কেউ কোথাও নেই, সে আর অ্যানি জ্যোৎস্না রাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

অ্যানি : কি গো সাগর, সুখী হয়েছ তো?

সাগর : সুখী হয়েছি ঠিক তবু পুরো সুখ কই।

অ্যানি : কেন সাগর?

সাগর : তুমি যেখানে ঘর বাঁধতে পারলে না সেখানে আমি ঘর বেঁধে পুরো সুখ ভোগ করি কি করে।

অ্যানি : এই যে আমি নেই বলে তোমরা আমার কথা এমন করে ভাবছ, এর চেয়ে বড় সুখ আমার কি আছে বল। ঘর বেঁধে এত ভালবাসা এত সুখ হয়তো পেতাম না।

সমাধি স্তম্ভের পাশের গাছের পাতা হাওয়ায় শব্দ করে উঠতেই ওদের তন্ময়তা ভেঙে গেল।

হিউম চলে গেলে বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল এ্যাডাম আর সাগর। পোর্ট অফিসে কাজে যায় এ্যাডাম. ফেরে বড় ক্লান্ত আর বিষণ্ণ মুখে। তার অফিসের সব ইউরোপীয় কর্মচারীই চলে গেছে, শুধু দায়িত্ব নিয়ে থেকে গেছে সে

একা। দেশীয় কর্মচারীদের নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে তাকে। পোস্ট অফিসে তারই মত একজন বিদেশী এখনও কাজ করে যাচ্ছে। লাইটহাউসে আর একজন। স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে এসেছিলেন এক আয়ারল্যাণ্ডবাসী। কিছু কাল পরে তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পান স্ত্রী এলা তাঁর অনুপস্থিতিতে পরপুরুষে আসক্ত হয়েছে। সেই থেকে তিনি ছোট্ট এক কুটির বানিয়ে এখানেই বসবাস করছেন। পঁচিশ বছর এই সমুদ্র আর নদীর সঙ্গমভূমিতে কাটিয়ে দিলেন তিনি। এখন ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধার হয়েছে তাঁর কিন্তু আর এক প্রবলতর ব্যাধির কবলে পড়েছেন তিনি। সে ব্যাধিটি, জরা। প্রথম জীবনে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য কাজ করতে পারেননি। স্বাস্থ্যোদ্ধারের পর বয়স বেড়ে যাওয়ায় মনোমত কাজ পাননি। তাই কোম্পানির কাজ না করে নিজের স্বল্প পুঁজিতে কোন রকম করে চালাচ্ছেন। নিজেই নিজের সব কাজ করে নেন। পোশাকে-আশাকে দৈন্যদশা, তবু কোন স্বজাতির সাহায্য চান না। চার্লস উইলিয়মসনের আর একটি সামান্য রোজগারের পথ আছে। ব্যবসায়-সূত্রে এ দেশীয় যে সব লোক সাহেব কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে উন্নতি করতে চায় তারা আসে উইলিয়মসনের কাছে কাজ চালাবার মত দু-একটা ইংরাজী বাক্য শিখতে। তারা শিক্ষাগুরুকে কিছু কিছু দক্ষিণা দিয়ে যায়।

ওদিকে পোস্ট অফিসে কাজ করে বোটেল্‌হো সাহেব। মেরী নামের একটি সুন্দরী বউ আর বাচ্চা নিয়ে এখানে এসেছে। জেফ্রি বোটেল্‌হোর বয়েস এ্যাডামের চেয়েও কম। কেউ খাজুরী বন্দরের ভাঙা হাটে ভিড়তে চাইছে না বলে পোস্টমাস্টারের পদটা এক কথায় পেয়ে গেছে বোটেল্‌হো। নতুন জায়গায় একটুও অসুবিধে বোধ করছে না নতুন বউ মেরী। মাঝে মাঝে এ্যাডামের বাংলোতে স্বামীস্ত্রী আসে নিমন্ত্রিত হয়ে। সাগরের সঙ্গে ভাব জমে গেছে মেয়েটির, কিন্তু কেউ কারু কথা বোঝে না। মধ্যাহ্নের কাজ করে এ্যাডাম। মেরীকে সারা বাগান ঘুরিয়ে দেখায় সাগর। আভাসে ইংগিতে দুজনের কথা দুজনে বোঝে। তাতেই কাজ চলে যায়। মেরীর ছ'মাসের ফুটফুটে বাচ্চাটা সাগরের চোখের মণি। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই সাগরের মনে হয় সে মা যশোদা হয়ে গেছে। তার বঞ্চিত রুদ্ধ মাতৃস্নেহের মুখ খুলে যায়। অবিরল ঝরে পড়তে থাকে স্নেহসুধা।

চার পাঁচ মাইল দূরে লাইটহাউসে কাজ করে কলিন বার্লো। অল্প বয়সে অর্থকরী বিদ্যায় বিশারদ হয়ে উঠেছে। টাকা রোজগারের ধান্দায়

এতই ব্যস্ত যে বিয়ে করার অবসর মেলেনি। হোম থেকে আসার সময় সে শুনে এসেছিল, ইণ্ডিয়ার এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে সোনার খনি। সেই খনি থেকে খুঁজে পেতে সোনা বের করে নিতে পারলেই হল।

এখানে এসে সেই সোনা কুড়ানোর কাজে লেগে গেছে বার্লো।

সমুদ্রের ধারে জেলেদের বাস। নৌকো আর জাল তৈরির জন্য অঢেল টাকা দাদন দিয়ে রাখে বার্লো। শীতে শান্ত সমুদ্রে মাছ ধরার হিড়িক পড়ে যায়। সে সময় ঠাণ্ডার জন্য সহজে মাছ পচে ওঠে না, দ্রুতগামী নৌকোয় চালান যায় কলকাতায়। এই মরশুমে দাদন দেওয়া টাকার অনেক গুণ তুলে নয় বার্লো।

তা ছাড়া আর একটি ব্যবসার পত্তন করেছে সে সম্প্রতি। পর্তুগীজরা সমুদ্রের ধারে ধারে এক সময় কাজুবাদামের চাষ শুরু করেছিল। তাদের চলে যাবার পর এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী দেখা যায়নি কাউকে। এর একটা ভাল বাজার হতে পারে অনুমান করে নিয়ে বার্লো বিভিন্ন মালিকের কাছ থেকে বেশ কয়েক বছরের জন্য ঐ সব বন্দোবস্ত নিয়ে নিল। সংগ্রহ থেকে বিচি বের করে নেওয়া পর্যন্ত কাজের জন্য বার্লো নিযুক্ত করল দরিদ্র মুসলমান মেয়েদের। সেই বাদাম প্যাক করে হিজলীর বাদাম লেবেল মেরে পাঠাতে লাগল কলকাতার বাজারে। জমে উঠল ব্যবসা। থলিতে সত্যিই সোনা ভরতে লাগল বার্লো।

এদিকে বিয়ে না করলেও বার্লোকে কেউ ব্রহ্মচারী অপবাদ দিতে পারত না। জেলেপাড়ার মেয়েদের প্রতি দিন মাছ দিয়ে আসতে হত লাইটহাউসে বার্লোর কোয়ার্টারে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলেছিল জেলে বস্তিতে দু-একটি দেবশিশুর আবির্ভাবে। কৃষ্ণকায় জেলের ঘরে শ্বেতবর্ণের শিশুর আবির্ভাবে অজ্ঞ জেলেদের পাড়ায় হৈচৈ পড়ে যেত। কোন দেবতা নিশ্চয় দয়া করে মানুষের ঘরে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। সে শিশুটি আদরের গোপাল হয়ে সবার কোলে কোলে ফিরত।

এ্যাডাম কিংবা বোটেলহোরা বার্লোকে পাত্তা দিতে চাইত না। বার্লোর সব অপকীর্তি তাদের জানা হয়ে গিয়েছিল। বার্লোর কথায় বার্তায় কিন্তু যাদু ছিল। সে যখন হঠাৎ এসে পড়ত এ্যাডাম কিংবা বোটেলহোদের বাংলোয় তখন কথার যাদুতে শ্রোতাদের অন্তত ঘণ্টা তিনেক মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে দিতে পারত। রসিকতা জমাতে চাইত সে মেয়েদের সঙ্গে। তার রসিকতা মার্জিত ছিল না। ইদানিং বার্লোকে দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখলেই

মেয়েরা ঘরের ভেতর আত্মগোপন করে থাকে। বার্লো যখন জানতে পারে মেয়েরা বাংলোতে নেই তখন সে পুরুষদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে কালক্ষেপ করতে চায় না। দু-চারটে কথা বলে কাজের অছিলায় সরে পড়ে।

এ্যাডামের বাংলোর পিছনে মস্ত এক বালির স্তূপ। সমুদ্র আগে এখানে বইত, তারপর এক সময় বালির সঞ্চয় রেখে সরে গেছে। বালির স্তূপকে এ অঞ্চলের লোকে বালিয়াড়ি বলে। এই বালিয়াড়ির তিন দিক ঘিরে কাঁটা বাঁশ, বুনো জাম, তেঁতুল আর চালতার বন। একদিক শুধু খোলা। সেদিকে তেকাঠি, আশ-শ্যাওড়া আর পুটুসের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সরু বালি বিছানো সিঁথি পথ। ঐ পথটা চার্লস উইলিয়মসনের ছোট্ট কুটির ছুঁয়ে নেমে গেছে একেবারে বেলা-ভূমির দিকে। কোন দিন ভাল কোন খাবার হলে ঐ পথে সাগর চলে যায় মিঃ উইলিয়ামসনের কুঠিতে। বৃদ্ধ হেসে বলেন, কি আবার এনেছ? আমি তো তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। আমাকে কেন ঋণী করে রাখছ?

সাগর বলে, এই তো সামান্য জিনিস। কাছে-পিঠে কেউ নেই যে রান্নাটা কেমন হল পরীক্ষা করিয়ে নি। তাই চলে আসি আপনাব কাছে।

তোমার সব রান্নাই সুস্বাদু। তোমার ব্যবহারও তেমনি সুন্দর।

সাগর নিজের প্রশংসায় সংকুচিত হয়। সে কথান্তরে চলে যায়। বলে, আচ্ছা, আপনার একা একা থাকতে কষ্ট লাগে না?

বৃদ্ধ আবার হাসেন। বড় প্রসন্ন হাসি। বলেন, একা কোথায়? অনেকের সঙ্গেই তো আছি।

কি রকম? কই কাউকেই তো দেখি না এখানে।

উইলিয়ামসন বলেন, এই তো তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আমার পরিবারের একজন। বলে উঠোনের একটা নারকেল গাছের দিকে আঙুল দেখালেন উইলিয়ামসন। বললেন, সারাদিন আমি ওর পাতার শব্দ শুনি। ঝড় উঠলে ও সারা দেহ দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে। তাছাড়া ভোরবেলা কত পাখি উড়ে আসে। কেউ শিস দেয়, কেউ একঝুড়ি কথা বলে যায়। নীল সমুদ্রের জলে সূর্যের লাল রঙের ছোঁয়া লাগলে পাল তুলে বেরিয়ে পড়ে কত নৌকো। এখানে বসে তাদের মাছ ধরার কৌশল লক্ষ্য করি। বেলা বাড়লে ওরা তীরে ফিরে এসে জাল থেকে মাছ ঝেড়ে নেয়। কোথা থেকে ঠিক সে সময়ে একটা হাড জিরজিরে কুকুর এসে জোটে ফেলে দেওয়া মাছের লোভে। শেষ বেলায় ঝাঁক ঝাঁক গাংচিল ঢেউয়ের মাথায় মাছের সন্ধানে উড়ে

বেড়ায়। রাতে বিছানায় শুয়ে সমুদ্রের একটানা ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর কি করে বলি যে আমি নিঃসঙ্গ।

সাগর এই প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা মানুষটিকে যেন নতুন করে চিনল। সাগর হঠাৎ জানতে চাইল, আপনি দেশের খবর পান?

না সাগর, এ দেশ ও দেশ, কোন দেশের কোন খবরই আমি রাখি না। এখন আমি আমার নিজের থাকবার মত করে একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছি। বেশ শান্তিতে আছি এ জগতে।

সাগর দেখে বৃদ্ধ উইলিয়ামসনের পোশাক জায়গায় জায়গায় ফেঁসে গেছে। যে বেতের চেয়ারখানায় বসে তিনি সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকেন তার বাঁধনগুলো শিথিল হয়ে গেছে।

সাগর এ্যাডামকে বলে এগুলো পরিবর্তন করে দিয়ে যেতে পারে কিন্তু বৃদ্ধের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে বলে ও প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাইল না।

'বালু-বস্তি'র যেসব লস্কর ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী, তারা নতুন নতুন বন্দরে চলে গেল খাজুরীর পাট তুলে। যে সব মুসলমান লস্কর এ অঞ্চলে বিয়ে সাদি করেছিল তারা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে কোথাও যেতে পারল না বলে পুরনো আস্তানা থেকেই জাহাজে যাওয়া-আসা করতে লাগল।

খাজুরী বাজারের আর সেই রমরমা নেই। কেনাকাটা, মালপত্র ওঠা-নামার ব্যস্ততা, ভীড় এখন আর দেখা যায় না। খাঁ খাঁ করছে সাহেব-নগর। সাহেবদের গোমস্তা বাবুর্চিরা কেনাকাটায় বাজারটা গরম করে রাখত, এখন তারা যে যার ধান্দায় অন্যত্র চলে গেছে।

ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে বাঁধা দোকানগুলো। দু-চারটে ভুষিমালের দোকান ছাড়া বাকীগুলোর ঝাঁপ আর খুলতে দেখা যাচ্ছে না। ক্রোশ পাঁচেক দূরে বীরবন্দরে এখন নতুন একটা বাজার জমজমাট হয়ে উঠেছে। রসলপুর নদী থেকে একটা খাল এসেছে বীরবন্দর গ্রামে। রসলপুর আবার হিজলীর পাশ দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। তাই ভেতরের গ্রাম-গ্রামান্তে উৎপন্ন শস্য আর কুটির-শিল্প জাত মাদুর, কাপড় ইত্যাদি বীরবন্দরে জমা হয়ে চারদিকে চালান যাচ্ছে।

বাদাম লিব গো বাদাম—মাথা থেকে একটা চাঙারী নামিয়ে উঠোনে

এসে বসল একটি প্রৌঢ়া। গরমের দিনের দুপুরবেলাগুলো অসহ্য হয়ে ওঠে। প্যাচপেচে ঘামে ডুবে যায় শরীর। সামনে বালির স্তূপ তেতে উঠে গরম ছড়ায়। এ সময় কাকপক্ষীটিও ওড়ে না। দু-একটা চিল কেবল আকাশে চক্কর দিতে দিতে হঠাৎ হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।

এ্যাডাম গেছে কাজে। সাগর মেঝেতে মাদুর পেতে বিশ্রাম করছিল। ডাক শুনে বাইরে বেরিয়ে এলো। দুজনেই দুজনকে দেখে অবাক।

বেহুলাদি তুমি!

তুই এখানে সাগর!

বেহুলা আজ প্রায় দশ-বারো বছর পরে সাগরকে দেখল। সে কোন সূত্রেই জানতে পারেনি যে সাগর সাহেবের বউ হয়েছে। মাসীর বাড় থাকতে সাগর সবকটি পতিতাকেই চিনত। সে সবাইকে দিদি বলে ডাকত। সবার ভেতর বেহুলা ছিল একটু আলাদা। বেশ ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই তাকে মনে হত। ছিলও তাই। বাল্যে বিধবা হয়েছিল। তারপর এক-দিন বেরিয়ে এসেছিল যৌবনের জোয়ারে। কয়েক হাত ঘুরতে ঘুরতে মাসীর কাছে এসে পড়ল। তারপর থেকে মাসীর ব্যবসা-ঘরেই বন্দী।

মাসী বন্দরের দিকে বেরিয়ে গেলে সবাই এসে জুটত মাসীর ঘরে। সাগর গান গেয়ে শোনাত আর ওরা শোনাত ওদের অভিশপ্ত জীবনের ইতিহাস। বলতে পারত ভাল বেহুলাদি। ভাল বাড়ির মেয়ে তাই জ্ঞান ছিল পুঁথিপত্রের। রামায়ণ, মহাভারত, মনসার ভাসান, সব কাহিনীই তার জানা ছিল। বেশ গুছিয়ে, জমি.য় গল্প শোনাত বেহুলাদি।

নিজের কথা বলতে গিয়ে বলত, বেহুলা মরা স্বামীকে নিয়ে ভেসেছিল আবার জ্যান্ত নিয়ে ফিরেও এসেছিল, কিন্তু আ।ম সেই যে ভাসলাম আর ফিরতে পারলাম না। কথাটা বলতে বলতে হেসে উঠত বেহুলাদি। কিন্তু সাগরের কেমন যেন মনে হত বেহুলাদি ছাতি ফাটিয়ে কাঁদছে।

এতদিন পরে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার পর দুজনেই অভিভূত। দুজনেই দুজনের কথা শুনল।

মাসী মারা গেল আর তার ভাইপো বলে এসে জুটল একটা মোদো-মাতাল। যার যেদিন খদ্দের জুটত না, তার নামে সেদিন ঘর ভাড়া লিখে রাখা হত। যেমন করে হোক মাসের শেষে সেটা শোধ দিতে হত তাকে। একদিন সুযোগ বুঝে পালালাম মাসীর আস্তানা ছেড়ে। প্রতি দিন ঝগড়া চেঁচামেচি আর ভাল লাগত না। অনেক দিন অনেক কষ্ট সহ্য করেছি

সাগর, এখন বেশ আছি ভাই। দেহে আর যৌবন নেই তাই বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। এখন টানা-হ্যাঁচড়া ছেঁড়াছেঁড়ি করতে শ্যাল, শকুনগুলো আর ভীড় করে আসে না। অভ্রানবাড়ির হাটে একটা চালার তলায় শুয়ে থাকি। বাতিঘরের সাহেবের কাছ থেকে বাদাম এনে ফিরি করি। দু-দশ পয়সা পাই, হাটের একপ্রান্তে ক্ষুদ ফুটিয়ে খাই। দিব্যি আছি।

সাগর দেখল কাপড়ে চুলে গায়ে দারিদ্র্যের শত লাঞ্ছনার চিহ্ন থাকলে কি হয় বেহুলাদির চোখে মুখে স্বাভাবিক একটা তৃপ্তির ছবি ফুটে উঠেছে।

* * *

।। সাত ।।

১২৪০ সাল। ভোরবেলার আকাশে তাল তাল মেঘ ঘূর্ণির মত পাক খাচ্ছে। দমকা বাতাসের ধাক্কায় ফুঁসে উঠছে মোহনার জল। ঢেউ গুলো ফণা তুলে ছুটে এসে রাশি রাশি গরল ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে তীরের জমিতে। আকাশ জুড়ে হঠাৎ হঠাৎ এলোপাথাড়ি কারা যেন সাঁই সাঁই চাবুক চালিয়ে যাচ্ছে। বাঁশের পাতাগুলো ছিঁড়ে-খুঁড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে কত দূর। সমুদ্রের ধারে জেলেবস্তির মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চা, হাঁড়ি-কুঁড়ি কাঁথা-কাপড়, জাল-বাঁশ নিয়ে সকাল থেকেই চলে যাচ্ছে কুঞ্জিপুরের দিকে। যাবার সময় বলে যাচ্ছে, বাতাস ভাল না, গাঙ ক্ষেপেছে। লোনা ছয়লাপি আসছে গো, লোনা ছয়লাপি।

কে আবার কবে নিজের ঘর ছেড়ে পালায়। গৃহস্থরা বসে রইল ঘরের ভেতর দরজা এঁটে। গরু ছাগল রইল গোয়ালে, হাঁস-মুরগী ধামা চাপা। কেউ আর এ দুর্যোগে চরতে বেরুল না।

কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই যেন তোলপাড় হয়ে গেল চরাচর! দূর সমুদ্রের বুকে একটা কালো দানব মাথা তুলল। তারপর অন্ধ আক্রোশে ছুটে আসতে লাগল জনপদের দিকে। বেলা শেষের অনেক আগেই অন্ধকার নেমে এসেছিল। কাছে পিঠের বহু মানুষ ঘরবাড়ি পড়ে যাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল এ্যাডাম সাহেবের বাংলোতে। এমন কি পতিতাপল্লী থেকে মেয়েরাও এলো সাগরের কাছে একটু আশ্রয়ের আশায়। পুরোহিত ত্রিলোচন পাণ্ডা নাক সিঁটকে ওদের স্পর্শ বাঁচিয়ে বারান্দায় পাতা খাটখানার ওপর উঠে বসলেন। সব দেখে শুনে সাগর ওদের সমাদর করে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। যেখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ছিল সেখানে বসাল তাদের হাত ধরে।

কোটি কোটি রাক্ষসের প্রাণ-ভোমরা যেন কানের কাছে মরণ চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। পাশের মানুষটির কথাও আর শোনা যাচ্ছে না।

সাগরের কাছে ছুটে এলো এ্যাডাম। বলল, একেবারে সমুদ্রের ধারে উইলিয়ামসনের বাড়ি। জায়গাটাও নীচু। আমি ওঁকে এখানে নিয়ে আসি।

সাগর চেঁচিয়ে বলল, তুমি যাবে কি করে? গাছপালা, মাটির দেওয়াল, ঘরের চাল সব ভেঙে পড়ছে।

মিঃ উইলিয়ামসনের বাংলোর পথে ও সব পড়বে না। একটা লাঠি দাও, আমি বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে চলে যাব।

সাগর জানে, এ্যাডাম যেমন জেদী তেমনি পরোপকারী আর হৃদয়বান। ওকে ওর প্রাণের ভয় দেখিয়ে ফেরানো যাবে না।

একটা লাঠি এনে দিতেই দরজা খুলে ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে গেল এ্যাডাম। ঘরে বসে থাকা এতগুলো মানুষের একজন সাহস করে এ্যাডামের সঙ্গী হল না। তারা বরং তিন চারজন মিলে খোলা দরজাটা প্রবল বিক্রমে বন্ধ করে দিল।

* * *

হু হু করে বন্যার জল বাংলোর একতলায় ঢুকে আসছে। ভীষণ তোড়ে কাঁপছে দরজা জানালা। সাগর পাগলের মত সারা ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল। এ্যাডাম কোথায় গেল। এখনও ফিরে আসছে না কেন?

বাংলোর ভেতরের লোকজন ঘরের মধ্যে জল ঢুকতে দেখে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। আরও নিরাপদ আশ্রয় চাই।

সাগর আর অপেক্ষা করতে পারে না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, কান ফাটানো হাওয়ার হাহাকার, ঘরে ঘরে পথে প্রান্তরে বন্যার সহস্র-ফণা নাগিণীর ছোবল। সাগর পিছনের দরজা খুলে উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধকারের সমুদ্রে। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন পতিতা মেয়ে সাগরকে অনুসরণ করে নেমে গেল বন্যার প্রবাহের মধ্যে।

হাঁটু জল ভেঙে অনুমানে এগোতে গিয়ে প্রবল এক জলের ঘুর্ণিতে পড়ে ভেসে গেল তারা। কিন্তু জলের স্রোত তাদের বেশি দূর টেনে নিয়ে যেতে পারল না। সামনের বালির স্তূপে ছ'জনেই আটকে গেল। উত্তেজনা আর আকস্মিক স্রোতের ঘুর্ণিতে দিশাহারা সাগর অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় পড়ে রইল ভেজা বালির স্তূপের ওপর। মেয়ে পাঁচটি ডাক হাঁক করে

নিজেদের অবস্থান বুঝে নিয়ে একসঙ্গে জড়ো হল। তারা অচেতনপ্রায় সাগরকে টেনে তুলল বালির স্তূপের ওপর। আকাশের জল, আর সমুদ্রের জল শুষে নিয়ে তখন বালির পাহাড়টা নিচু আর নিরেট হয়ে গেছে।

থেমে গেছে কখন বিধ্বংসী ঝড। আকাশ থেকে মুছে গেছে মেঘের কালি। ভোরের আলো ফুটে উঠল। পাঁচটি পাততা টেনে তুলল হতবুদ্ধি সাগরকে। চতুর্দিক জলে জলময়। গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। বালির পাহাড়ের সবটুকু প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। আছে কেবল মাথাটুকু।

তিন দিন তিন রাত পরে সমুদ্র ধীরে ধীরে ডাঙা থেকে টেনে নিল সবটুকু জল। শুধু পথে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে রইল জল-নাগিণীর ছোবলে মৃত পশুপাখি আর মানুষের স্তূপ। বারশো চল্লিশ সালের লোনা ছয়লাপিতে মারা গেল খাজুরী অঞ্চলের তিন ভাগ মানুষ আর পশু। নৌকো আর জাহাজ ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ভাঙা কাঠের টুকরো আর পেরেকে সমাকীর্ণ হয়ে গেল সমুদ্রতীর।

তিনদিন পরে বৃদ্ধ উইলিয়ামসনের ঘরের ভেতর থেকে মাথা প্রমাণ জল নেমে গেলে দেখা গেল যেন পলির আস্তরণে তৈরি একটি মূর্তি লম্বা হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে। সে মূর্তির বুকের ওপর পলি দিয়ে তৈরি একটি বেহালা।

উইলিয়ামসন কি ঝড়ের তাণ্ডবের সঙ্গে তান তুলে বেহালা বাজাতে বাজাতেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন?

পোস্ট অফিসের সংলগ্ন কোয়ার্টারে যখন হু হু করে জল ঢুকে পড়েছিল তখন নিশ্চয়ই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল মিঃ বোটেলহো! সেই ভয়াবহ দুর্যোগে আত্মরক্ষার তাগিদে স্ত্রীর হাত ধরে কোয়ার্টার ছেড়ে নেমে পড়েছিল পথে। সামান্য কয়েক পা এগোলেই পোস্ট অফিস। তার দোতলায় কোন রকমে একবার উঠতে পারলেই মোটামুটি নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওটুকু পথ আর কোন দিনই পেরুতে পারল না বোটেল্হো পরিবার। জলের তীব্র স্রোতে ভেসে গিয়ে আটকে গেল বাউণ্ডারী পাঁচিলের গায়ে।

জল সরে গেলে দেখা গেল মিঃ বোটেল্হো ডুবজলের ভেতর কোন কিছু হাতড়ে খোঁজার ভঙ্গীতে হাঁটু মুড়ে দু'বাহু প্রসারিত করে রয়েছে। একটু দূরে মেরী শুয়ে আছে শিশু সন্তানটিকে বুকে জাপটে ধরে। মৃত জননীর হাতের বাঁধন থেকে শিশুটিকে মুক্ত করা যায়নি। সে অবস্থাতেই কবর

দেওয়া হল মা ও শিশুকে। সেই স্বর্গীয় শোকের দৃশ্যটুকু দেখার জন্য খাজুরী সমাধিক্ষেত্রে সেদিন মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানুষই উপস্থিত ছিল।

শুধু একটি মানুষই হারিয়ে গেল পৃথিবীর মাটিতে সামান্য চিহ্নটুকু না রেখে। সপ্ত সাগরের স্রোতে ভেসে ভেসে চলে গেল তার দেহ।

পনেরোটি দিন অবিশ্রাম সমুদ্রের তীরে ঘুরে ঘুরে ফিরে এলো ভুবন ভক্তা মেয়ের কাছে। কাতর গলায় বলল, পেলাম না মা তার কোন চিহ্ন। সে আমাদের চোখের সামনে থেকে চিরদিনের মত সরে গেছে।

সাগর বলল, আমি চোখ বুজলেই তাঁকে দেখতে পাই বাবা।

মাস দুয়েকের ভেতরেই সাগর তার বাংলো আর জমি জায়গার একটা ব্যবস্থাপত্র তৈরি করল। লোক পাঠিয়ে খুঁজে পেতে আনল বেহুলাদিকে। তার হাতে তুলে দিল সমস্ত সম্পত্তির ভার। এদিকে খদ্দেরের অভাবে উঠে গিয়েছিল পতিতালয়টি। সাগর অসহায় সংসার-ছাড়া ক'টি মেয়েকে ডেকে আনল।

সবাইকে কাছে ডেকে বলল, তোমাদের জন্য রেখে গেলাম আমার সব-কিছু। শুধু অনুরোধ, কাজের ভেতর দিয়ে পবিত্র ভাবে জীবনটাকে কাটিয়ে দাও। বেহুলাদি তোমাদের সকলেরই প্রিয়। তিনি তোমাদের বড় বোনের মত পরিচালনা করবেন।

এক প্রভাতে ভুবন এসে দাঁড়াল মেয়ের পাশে। বলল, কোথায় যাবি মা ?

পথে বাবা।

এখন কি আর পথ হাঁটতে পারবি মা ?

কেন পারব না বাবা। একদিন সমাজে ঠাঁই না পেয়ে তুমি আমি তো পথে পথেই ঘুরেছিলাম।

তবে চল মা, পথেই আবার নামি—

আমার গৌরকৃষ্ণ পথে লুকিয়েছে বাবা, আমরা পথ থেকেই তাকে খুঁজে পাব।

॥ শেষ ॥

বুকের মধ্যে সাগর

গীর্জার চূড়োয় ঘন্টাটা ঢং-ঢং-ঢং-ঢং শব্দে বেজে চলেছে। পায়রাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে ভোরের আকাশে। সাদা কালো পাখা হাওয়ায় ভাসিয়ে ওরা এখন চক্কর দিতে শুরু করেছে। গীর্জার চূড়ো ঘিরে একটা ঘূর্ণাচক্র তৈরী করে নিয়েছে ওরা। ফাদার আরেতিনো গীর্জার ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে ছড়ানো শস্যকণা খাবার শেষে পায়রাগুলোকে দু'হাতে ধরে উড়িয়ে দিচ্ছলেন। নীল আকাশে কার্তিকের একটা সাদা মেঘ ইজিপ্সিয়ান তুলোর তালের মত দাঁড়িয়ে আছে। ফাদারের সাদা পোশাক। ধবধবে সাদা দাড়ি। হাতে সাদা পায়রা। সামনে থমকে থাকা সাদা মেঘ। সব মিলিয়ে শুভ্র শ্বেত রঙের একটা আশ্চর্য হারমোনি। দূরে বালুর উঁচু-নীচু সোনালী ঢিবি আর মাঝে মাঝে জেগে ওঠা বনঝাউয়ের জটলার পারেই সমুদ্র। হেমন্তের সমুদ্রের গ্রীষ্ম-বর্ষার আভাল-পাথাল ভাব নেই। অনেক শান্ত। মাঝে মাঝে শুধু তটে আছড়ে পড়ার একটা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

কয়েকটি কালো পাথরে কোঁদা মূর্তি অদ্ভুত ভঙ্গীতে উচু নীচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ধরে রেখেছে তাদের টেপ্‌পা নৌকোগুলো। সমুদ্দুরের জল ঠেলে সূর্যি উঁকি দিলেই ওরা শিমূলকাঠে তৈরী টেপ্‌পাগুলো শোলার মত ভাসিয়ে দিয়ে তাতে চড়ে বসবে। তারপর ঢেউ ভেঙে ভেঙে এগিয়ে যাবে অনেকখানি দূরে। মাছ ধরবে। কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে তাকাতে ভুলবে না গীর্জার চূড়োর দিকে। ওদের বিশ্বাস, যদ্দুর থেকে ওরা গীর্জাটা দেখতে পাবে ঠিক তদ্দুরই ওদের সমুদ্রে বিচরণের সীমা। তার বাইরে গিয়ে পড়লেই বিপদ ঘটবে অবধারিত।

গীর্জার ঘণ্টি সমানে বেজে চলেছিল। সারা নুলিয়া পল্লী জেগে ওঠে ঐ শব্দে। ওরা ঘন্টার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ভোরের কাজ শুরু করে।

এইমাত্র গীর্জার ঘন্টা থেমে গেল।

রক্তগোলকের আকার ধরে ধূসর নীল সমুদ্রের গর্ভ থেকে লাফ দিয়ে

পুরান-কথিত কোন জাতকের মত সূর্যটা জেগে উঠেছে। টেপ্‌পা নৌকো-গুলো টালমাটাল মাতালের মত আছাড় খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। হাওয়ায় উড়ে আসা ফাগের মত একটা মিহি লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। সাগরের নালে, নুলিয়াদের কালো গায়ে, গাংশালিকের পাখায়, আর ধবধবে সাদা গীর্জার চুড়োয়।

ফাদার আরেতিনো তাঁর সাদা পোশাক আর দাড়িতে আবীর মেখে ফাগের রঙ লাগা মেঘটার দিকে চেয়ে ছিলেন। ঘন্টা থামলে হঠাৎ পেছন ফিরে, তিরাইয়া তিরাইয়া বলে ডাকতে লাগলেন।

কালো পাথরে গড়া একটা তরুণ মূর্তি ফাদারের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

ফাদার আরেতিনো বললেন, গাড়ি বের কর, টাউনে যেতে এক ঘন্টার ওপর লেগে যাবে। ততক্ষণে স্টেশন থেকে মোটর রাতের প্যাসেঞ্জার নিয়ে এসে পড়বে।

তিরাইয়ার দেহটা গীর্জার ভেতর অদৃশ্য হল।

কিছু পরে দেখা গেল একটা কালো ঘোড়ায় টানা ফিটন চার্চের বাঁধানো রাস্তায় তবলার বোলের মত আওয়াজ তুলতে তুলতে পশ্চিমে টাউনের দিকে মুখ করে বেরিয়ে গেল।

ফিটন যখন ফিরল তখন প্রায় বারোটা বাজে। নীল সমুদ্রের বুকে রূপোর ঝকঝকে তীর ছুঁড়ছে সূর্য। নুলিয়ারা নৌকোগুলো ডাঙায় তুলে দিয়েছে। বালুর নরম বিছানায় উলঙ্গ মেয়ে-পুরুষের মত পাশাপাশি কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে টেপ্‌পা নৌকোগুলো।

একটি তরুণী নামল ফিটন থেকে চার্চের লনে। ফাদার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে জড়িয়ে ধরলেন তরুণীটিকে।

নোরা, নোরা।

এলিনোরার সোনালী চুল খেলা করছে কাঁধের ওপর। সে তেমনি জড়িয়ে ধরে আছে বৃদ্ধ ফাদারকে।

তিরাইয়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেল গীর্জার ভেতর। এক হাতে ধরে রেখেছে কাঁধের ওপর হোল্ডলখানা, অন্য হাতে ঝুলছে বিরাট আকারের একখানা সুটকেশ।

এই সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের কিছু দূরে রসুলপুর নদী সাগরে এসে মিশেছে। এককালে এই নদীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সমৃদ্ধিশালী একটি বন্দর ছিল। বিদেশ থেকে বৃহৎ জাহাজগুলো ঐ বন্দরে এসে দাঁড়াত।

তখন ভাগীরথীর পথে কলকাতা অবধি যাতায়াত বড়বড় জলযানের পক্ষে কষ্টকর আর বিপজ্জনক ছিল। তাই বন্দর থেকেই আরোহী আর মালপত্র শ্লুপ নামের ক্ষুদ্র জলযানগুলির সাহায্যে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছত। ঐ বন্দরের সমৃদ্ধির যুগে রসুলপুর নদীর দক্ষিণে এই গীর্জাটি গড়ে ওঠে। বিদেশী শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা রসুলপুর নদীপথে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে জড়ো হত এই গীর্জার প্রাঙ্গণে।

গীর্জাটি ছিল সমুদ্রের নতুন চরের ওপর দাঁড়িয়ে। চার পাঁচ মাইলের ভেতর কোন লোকালয় ছিল না। গীর্জার ফাদারেরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য অতি ভোরে দূর দূর অঞ্চলে বেরিয়ে যেতেন। ফিরে আসতেন সন্ধ্যার আগে জনমানবহীন এই সুন্দর গীর্জাটির ভেতর।

একসময় রসুলপুর নদীর ওপারের বন্দর নানা কারণে পরিত্যক্ত হল। শ্বেতাঙ্গরা ফিরে গেল দেশে। কেউ বা চলে গেল প্রাসাদনগরী কলকাতায়।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রতীরবর্তী চার্চটিরও গুরুত্ব গেল কমে। মিশনারীরা বেশ কিছুকাল নানাভাবে গীর্জাটির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। রুটিন মাফিক খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের কাজও চলল। কিন্তু এক সময় ইয়োরোপের প্রধান মিশন থেকে যখন অর্থ সাহায্য বন্ধ হয়ে গেল, তখন মিশনারীরা একে একে চলে গেলেন স্বদেশে।

গেলেন না শুধু একজন। মিশনারী যুবক আরেতিনো। মানুষের সেবা করতে এসে ফিরে যাওয়াটা তাঁর মনঃপূত হল না। তিনি একাই থেকে গেলেন বিশাল গীর্জাটি আগলে।

বিত্তবান ঘরের ছেলে ছিলেন আরেতিনো। তিনি তাঁর ভাইকে লিখে জানালেন সব কথা। দেশে থেকে যাতে নিয়মিত কিছু অর্থ আসে তার বরাদ্দের জন্য অনুরোধ জানালেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভাই পেরুজিনোর কাছ থেকে সাহায্য এল। নির্দিষ্ট সময়ে সে সাহায্য নিয়মিত আসতে লাগল।

ফাদার আরেতিনো মনে বল পেলেন। তিনি প্রচারের কাজে আবার মেতে উঠলেন।

সমুদ্রতীর থেকে মাইল পাঁচেক পথ প্রায় জনহীন। ঐ পথটি গীর্জার সমৃদ্ধির যুগে তৈরী করা হয়েছিল। পাঁচ মাইল দূরের মফস্বল টাউনের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সেতু এই পথটুকু।

ফাদার আরেভিনো সকালের আলো ফুটলেই কিছু খাবার ব্যাগে ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। সঙ্গে থাকত খ্রীষ্টধর্মের ছবিওয়ালা নানারকম বই আর এক বাক্স হোমিওপ্যাথি ওষুধ।

মফস্বল শহর পেরিয়ে তিনি ডাইনে বেঁকে যেতেন সাঁওতাল পল্লী আর অতি দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষগুলির আস্তানায়।

গাছতলায় বসে রোগী দেখে ওষুধ দেওয়া শেষ হলে করুণাময় খ্রীষ্টের কথা বলতেন। সবাই বসে শুনত। ফাদার আরেভিনোর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হত।

বেলা হলে যে যার ঘরে চলে যেত। কেউ বা কিছু ফল, কেউ বা ভাঁড় করে খানিক দুধ দিয়ে যেত ফাদারের সেবার জন্যে।

ফাদার ছায়াচ্ছন্ন গাছতলায় বসে দুপুরের আহার সেরে নিতেন।

দূরের মাঠে গরু চরাতে চরাতে দুপুরের রোদ থেকে যে সব ছেলেরা মাথা বাঁচাবার জন্য ঐ গাছতলায় আসত, ফাদার তাদের কাছে গল্প বলতেন। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের, নোয়ার নৌকোর গল্প. আর খ্রীষ্টদেবের উপদেশমূলক গল্পগুলি।

ছেলেরা হাঁ করে শুনত। ফাদার সত্যিই ভাল কথক ছিলেন। তিনি জানতেন মাটি নরম থাকতে থাকতেই বীজ ফেলতে হয়। এইসব কিশোর মনেই খ্রীষ্টের বাণী গেঁথে দিতে হবে। পরিণামে এরাই হয়ে উঠবে খ্রীষ্টভক্ত।

জীবনের বেশ কয়েকটি বছর এমনি করে পার করে দিলেন ফাদার আরেভিনো। তারপর কালের নিয়মে ধীরে ধীরে বৃদ্ধ অশক্ত হয়ে পড়লেন।

বছর আটেক আগে ফাদারের ভাই পেরুজিনো এসেছিলেন দেশভ্রমণে ইণ্ডিয়াতে। সপরিবারে প্রায় বছরখানেক কাটিয়ে গিয়েছিলেন এই নির্জন সমুদ্র সৈকতে দাদার কাছে। সঙ্গে এসেছিল তাঁর এক ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড। শিকারের বাতিক ছিল ভদ্রলোকের। নদীর চরে চরে, দূর জঙ্গল মহালে পার্টি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। পাখি শিকারের নেশায় পেয়ে বসেছিল তাঁকে।

একদিন ওরা রসুলপুর নদীর ওপারে শিকারে গিয়েছিলেন। একটি ঝিলে পাখি শিকারের সময় পরিচয় হল একটি লোকের সঙ্গে। লোকটি বিদেশী দেখে আভূমি নত হয়ে নমস্কার করলে। পরিচয়ে জানা গেল, সে নদীর ওপারে মহকুমা কোর্টের পেশকার।

ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে সে কথা বলছিল।

পেরুজিনো কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলেন, ঐ ঝিল মহালটি এক

জমিদারের। তিনি এখন অবস্থা বিপাকে পড়েছেন। বকেয়া খাজনার দায়ে নিলামে উঠবে এই মহাল।

কি ভাবলেন পেরুজিনো, সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে বললেন, তুমি দেখা শোনার ভার যদি নিতে পার তাহলে আমি কিনতে পারি এই মহাল।

লোকটি প্রথমে বিস্মিত, তারপর কৃতার্থ হয়ে গেল।

পেরুজিনো চার্চের ফাদার আরেতিনোর নামে নিলাম ডেকে কিনে নিলেন ঝিল মহালটি।

দেশে ফিরে যাবার সময় দাদা আরেতিনোকে বললেন, দূর দেশ থেকে টাকা পেতে তোমার অসুবিধে হতে পারে, তাই কেনা রইল এই মহাল। এর দেখা-শোনার ভারও দিয়ে গেলাম উপযুক্ত লোকের হাতে। বছরে এর থেকে তুমি যা পাবে তাতে চার্চের কাজ চালাতে তোমার কোন অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

উত্তরে আরেতিনো হেসে বলেছিলেন, আমি প্রভুর সেবক, আমাকে আবার জড়াচ্ছো কেন সংসারের বৈভবের ভেতর ?

পেরুজিনো উত্তর দিয়েছিলেন, সাধুদেরও সংসারী মানুষের মত ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, সুতরাং জীবন-ধারণের জন্য উপযুক্ত উপায়ও তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে।

চুপ করে গিয়েছিলেন আরেতিনো। তিনি আর কথা বাড়াননি।

পেরুজিনো জানতেন তাঁর দাদাটি চিরদিন সংসার-বিবাগী মানুষ। তাই তিনি আশ্বাস দিয়ে আবার বললেন, তোমাকে আশা করি ঐ জমিজমা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। যে লোকটিকে নিযুক্ত করা হয়েছে সে বেশ বুদ্ধিমান। কেবল তোমার পাওনাটুকু বছরে বছরে বুঝে নিও তার কাছ থেকে।

সেই থেকে ঐ ঝিল মহাল হল চার্চের সম্পত্তি। কৈলাসপতি মণ্ডল রইল ঐ মহালের তদারকীর কাজে। অতি বিনয়ে ভূলুণ্ঠিত কৈলাসপতি।

পেরুজিনো ইণ্ডিয়া থেকে সাতটি বছর যেতে না যেতেই কৈলাসপতি এই ঝিল মহালের আয়ে নিজেরও বেশ কিছু জমি-জায়গা করে আখের গুছিয়ে নিয়েছে। কৈলাসপতির পুত্র বক্রেশ্বর 'বাপকা বেটা' প্রবাদবাক্যের সার্থক উদাহরণ আর পিতার অবিকল প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থ উপার্জনের নানা পথ আবিষ্কারেই তার আনন্দ। সে ঐ মহালের টাকায় সাবাড জেলেদের নৌকো তৈরী করে দিয়ে বিপুল ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। অনেক দূরের সমুদ্রে এই সাবাড় জেলেরা নৌকো নিয়ে বড় বড়

মাছ ধরতে যায়। বিশেষ করে ইলিশের মরশুমে এরা ক'মাস সমুদ্রেই কাটিয়ে আসে। মাছ ধরে কিন্তু নামমাত্র দামে ওদের বেচে দিতে হয় মহাজন বক্রেশ্বরের কাছে। বক্রেশ্বর তাই নিয়ে জমিয়ে বসেছে ফলাও ব্যবসা।

নামে ফাদার আরেন্তিনো সমস্ত লাভালাভের মালিক, কিন্তু বক্রেশ্বরই এ ব্যবসার লায়ন শেয়ারটা ভোগ করছে।

ঠিক যেদিন ফাদার আরেন্তিনোর ভ্রাতুষ্পুত্রী তরুণী এলিনোরা রোম থেকে এলো সমুদ্রতীরের নির্জন চার্চে সেদিন ঘটনাচক্রে বেলা শেষে চার্চে এল বক্রেশ্বর।

ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল সে। বৃদ্ধ কৈলাসপতির পাঠানো কিছু টাকা এনেছিল সে সঙ্গে করে।

বক্রেশ্বর অনেক দূরের জিনিস দেখতে পায়। লোকে বলে, শকুনির মত এক জোড়া চোখ আছে নাকি তার। আরও বলে, এ দুটো চোখ বাপ কৈলাসপতির কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

চোখ দুটো সারাদিন চরাচরের চারদিকে ঘুরছে। যেখানে চোখ গিয়ে পড়ছে সেখানেই মন্দ। মন্দ দেখার জন্যেই যেন বিশ্বকর্মা বানিয়ে দিয়েছেন বক্রেশ্বরের ঐ চোখ।

গীর্জা থেকে বেশ কিছুদূরে তখন বক্রেশ্বর। ঘোড়ার রাশ হঠাৎ সে টেনে ধরল। কারা যায়!

গীর্জার উত্তর দিকে বনঝাউ আর বালির পাহাড় ভেঙে দুটি মূর্তি চলেছে সমুদ্রের খাঁড়ির দিকে। একবার দেখা যাচ্ছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে বালির ঢালে।

কালো চেহারার যুবকটিকে চিনতে ভুল হয়নি বক্রেশ্বরের, কিন্তু কে এই শ্বেতাঙ্গ তরুণী! তার এই পঁচিশ বছরের জীবনকালের মধ্যে চার্চের ভেতর সে আসতে দেখেনি কোন তরুণী শ্বেতাঙ্গিনীকে।

কৌতূহলটা মনে চেপে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে বক্রেশ্বর এসে পৌঁছল গীর্জার সামনে।

ফাদার বসেছিলেন লনে। দুটি পাম গাছের ফাঁকে তাকিয়েছিলেন সমুদ্রের দিকে। ঘোড়ার খুরের শব্দ বেজে উঠতেই পাশ ফিরে তাকালেন।

বক্রেশ্বর ঘোড়া থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ফাদার পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। বক্রেশ্বর ফাদারের দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু নুইয়ে হঠাৎ বলে উঠল, এখানে কি কেউ নেই

ফাদার আমার ঘোড়াটাকে নিয়ে যাবে আস্তাবলে ?

ফাদার আরেতিনো কোন কথা বললেন না। তিনি এগিয়ে গিয়ে বক্রেশ্বরের ঘোড়ার লাগামটা ধরে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে চললেন।

বক্রেশ্বর নিজের ভুলটা মুহূর্তে বুঝে নিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফাদারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল ঘোড়ার লাগাম। বলল, ছি ছি, অপরাধী করলেন আমাকে। আমি চার্চের ঐ চাকর তিরাইয়াকে খুঁজছিলাম।

ফাদার শান্ত গলায় বললেন, আমার চার্চে কোন চাকর নেই। আর কাজের মানুষকে যদি চাকর বল তাহলে আমরা সবাই চাকর। আমি, তিরাইয়া, তোমার বাবা সকলেই।

বক্রেশ্বর অপমানটা অনেক কষ্টে ঢোঁক গিলে বুকের ভেতর চালান করলে। ঘোড়ার লাগামটা আস্তাবলের সামনে একটা বাদামগাছের কাণ্ডে বাঁধতে বাঁধতে দাঁতে দাঁত চেপে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল, শালা বুড়ো জ্ঞান দিচ্ছে। জমিদারী যেদিন লাটে তুলব শালা সেদিন বুঝবে কত ধানে কত চাল।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে প্রায় আনত হয়ে একটা নমস্কার করে দাঁড়িয়ে রইল ফাদারের সামনে।

ফাদার আরেতিনো তার পাশের কুর্শিতে বক্রেশ্বরকে বসতে বললেন। বক্রেশ্বর মুখে এমন একটা ভাব ফোটালে যেন সে কৃতার্থ হয়েছে।

ফাদার শান্ত গলায় বললেন, কৈলাসপতির শরীর ভাল তো ?

বক্রেশ্বর বুদ্ধি করে বলল, আজ্ঞে হাঁ, প্রভুর কৃপায় ভালই আছেন। তবে এখন ফসল ঝাড়াই-মড়াইয়ের সময়, তাই আদায় উসুল করার জন্যে বড় বিব্রত। আমার হাতে যৎসামান্য আদায়ী অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, বাকী টাকা আদায় হলেই নিজে নিয়ে আসবেন আপনার কাছে।

ফাদার বললেন, তোমার বাবা বড় সৎ, পরিশ্রমী আর কর্তব্যপরায়ণ। তার অন্তরে নিত্য প্রভু বিরাজ করছেন।

বক্রেশ্বর মনে মনে হেসে মুখে বলল, তাঁর যা কিছু উন্নতি সবই আপনার কৃপায় হয়েছে ফাদার। তিনি দু-বেলা প্রভু যীশুর নাম না উচ্চারণ করে জলগ্রহণ করেন না।

(গদ গদ গলায় কথা শেষ করে মনে মনে বলল, যীশুর নাম করে না হাতী। তবে কিছু হাতিয়ে নিয়ে প্রভুর গুণগান করে বলে, খ্রীষ্টদেব, তোমার

দৌলতে এ অধম সামান্য-ক্ষুদ কুঁড়োর সংস্থান করল। আমার পাপ না নিলে কেতার্থ হই।)

ফাদার আরেভিনো এবার অন্য প্রসঙ্গে এলেন, চার্চের তহবিল থেকে যে সব জেলেদের দাদন দেওয়া হচ্ছে, তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হচ্ছে বলে কি তুমি মনে কর?

বক্রেশ্বর বলল, পয়লা নম্বরের শয়তান ঐ সাবাড জেলেগুলো। টাকা নেবার সময়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না, কিন্তু টাকা শোধ-দেবার সময়ে টিকির নাগাল মেলে না।

ফাদার বললেন, মানুষকে শয়তান বলে সম্বোধন করতে নেই বক্রেশ্বর। ওরা ছেলেপুলে নিয়ে সংসার পেতেছে, ওদেরও তো সংসারটা চলা চাই। সেই বর্ষার পর বেরিয়ে গেল বাহার দরিয়ায় নৌকো ভাসিয়ে, ফিরল শীতের শেষে। এতগুলো মাস সংসার ছেড়ে ওরা যে সমুদ্রে কাটাল সে তো শুধু ছেলেমেয়েদের মুখে দুমুঠো খাবার দেবার জন্যে। বেচারাদের দুঃখ সত্যি দেখা যায় না।

বক্রেশ্বর অমনি একটি চাল চালল, বাবাও ঠিক আপনারই মত কথা বলেন ফাদার। তিনি কত টাকা যে ওদের মাপ করে দেন তার লেখা-জোখা নেই।

(মনে মনে বলল বক্রেশ্বর, আমার তেমন বাবা কি না। সাবাড জেলে-গুলো পাছে পাইকারী নৌকোতে গোপনে বেশী দামে মাছ পাচার করে তাই ফি হপ্তা ওদের কাছে গিয়ে ট্যাঁক দেখে আসে। টাকা থাকলেই কেড়ে আনে। নুলিয়ার মাগ-ছেলে মরল তো কৈলাসপতির ভারী বয়েই গেল। তুমি দয়ার সাগর হয়ে থাক ফাদার, আমরা কিছু লুটেপুটে খাই।)

ফাদার বললেন, তোমার বাবা যে জেলেদের দাদনের টাকা মাপ করে দেয় তা আমি জানি। ও হিসেব দিতে এসে বড় লজ্জায় পড়ে। আমি কিন্তু মনে মনে খুশী হই। কৈলাসপতির হৃদয়ে দয়াময় প্রভু বাস করছেন দেখে আমি বড় আনন্দ পাই।

বক্রেশ্বর হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, বাবা তো আপনাকে করুণা-ময় বলে মনে করেন।

(মনে মনে বলল, করুণাময় না ঘেঁচু, আস্ত একটি বুদ্ধু বলে মনে করে।)

ফাদার বলে উঠলেন, কোন মানুষকে করুণাময় ভাবা অন্যায়। সব

করুণার উৎস তিনি। তিনি দিলে তবেই মানুষের হৃদয় থেকে নিত্য করুণার ধারা বইতে থাকে।

ফাদার চোখ বুজে বলতে লাগলেন, 'The water I gave them' she said, 'becomes a perpitual spring within them, watering them, forever with eternal life.'

ফাদার চোখ দুটি বন্ধ করে প্রভুর অপার করুণার কথা ভাবতে লাগলেন। বক্রেশ্বরের চোখ দুটো কিন্তু ঘুরতে লাগল। বালুর স্তূপ, বনঝাউ আর সমুদ্র। নাঃ, কোথাও দেখা যাচ্ছে না ওদের। ডাগর মেয়েটাকে নিয়ে শালা নুলিয়ার বাচ্চাটা উধাও হয়ে গেল নাকি রে।

একটু আগে এলিনোরা দাঁড়িয়েছিল জল ছুঁয়ে। ওর পায়ের গোছ ডুবে যাচ্ছিল ঢেউয়ের ধাক্কায়। ঢেউ সরে গেলে বালির ভেতর বসে যাচ্ছিল ওর গোড়ালি সমেত পায়ের পাতা। একটা অদ্ভুত শিউরে উঠা অনুভূতি উঠে আসছিল পায়ের তলা থেকে। সে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছিল শরীরের প্রতিটি কোষে।

এখন এলিনোরা এসে বসেছে বনঝাউয়ের জটলার ভেতর একখণ্ড উঁচু-নীচু বালির জাজিমে। পেছনে একটা বালির পাহাড়। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে তিরাইয়া।

এলিনোরা ঢেউয়ের আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলল, তুমি যে আমাকে ঝিনুক কুড়িয়ে দিতে সে কথা মনে আছে?

তিরাইয়া মুখ ফেরাল। এলিনোরার কাছে এসে বলল, এখানে ওখানে ছুটে ছুটে তুমি ঝিনুক কুড়োতে। আমি তোমার পেছন পেছন চলতাম, আর তোমার না দেখে ফেলে যাওয়া অনেক সুন্দর ঝিনুক তোমার হাতে তুলে দিতাম।

এলিনোরা বলল, আচ্ছা, ক'বছর আমাদের ছাড়াছাড়ি বল তো?

তিরাইয়া একটু ভেবে বলল, বছর সাতেক মনে হচ্ছে।

ঠিক বলেছ, আশ্চর্য তোমার স্মরণশক্তি তিরাইয়া! আমি যখন প্রথম আঙ্কেলের এখানে আসি তখন আমার এগারো বছরের জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। এখন আমার বয়েস উনিশের কোঠায়। আর এখানে ছিলাম পুরো একটি বছর।

তিরাইয়া একটু দূরে বালির ওপর বসল। বসেই বলল, বড় দুরন্ত ছিলে তুমি। মনে আছে, জন্মদিনের ক্যাণ্ডেল জ্বালাতে গিয়ে অসাবধানে

পোশাকে আগুন ধরিয়ে ফেলেছিলে ?

এলিনোরা হেসে বলল, খুব মনে আছে। তুমি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আগুন নিভিয়েছিলে।

তিরাইয়া বলল, উপকারের পুরস্কার সেদিন কি পেয়েছিলাম মনে আছে ?

এলিনোরা বলল, সত্যি, এখন সে কথা ভাবলে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে, আর আমি পাট করা সুন্দর পোশাক-খানা নষ্ট হয়ে গেল বলে তোমার চুল টেনে কীল মেরে তোমাকে অস্থির করে তুললাম।

তিরাইয়া হেসে বলল, তুমি খুব চঞ্চল আর জেদী ছিলে। পরের দিনও তোমার রাগ পড়েনি। আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলে দোতলা থেকে নীচে। ভাগ্যিস বালি ছিল, তাই সে যাত্রায় রক্ষে পেয়ে গিয়েছিলাম।

এলিনোরা বলল, উঁহু. তুমি সব ভুলে গেছ। তোমার বুকে না কোথায় যেন চোট লেগেছিল। তোমাকে ঘোড়ার গাড়িতে করে বাবা টাউনের হস্পিটালে নিয়ে গিয়েছিল। তোমার সঙ্গে যাব বলে আমার সে কি কান্না। গাড়ির পেছন পেছন কদ্দুর কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গিয়েছিলাম। আঙ্কেল এসে আমাকে অনেক বুঝিয়ে তবে চার্চে ফিরিয়ে আনেন।

তিরাইয়া বলল. আমাকে হস্পিটালে নিয়ে যাবার সময়ে তুমি যে কেঁদে-ছিলে তা আমি জানতাম না। তবে তোমার কান্না দেখেছিলাম, জঙ্গল মহালের ঝিলে পাখি শিকারের দিন।

এলিনোরা একটুখানি ভাববার চেষ্টা করে বলল, ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না, আমি বুঝি খুব কেঁদেছিলাম ?

তিরাইয়া বলল. তোমার বাবা-মা আর তোমাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড মিঃ জিয়োভানী নদীর ওপারে শিকারে গিয়েছিলেন। তুমি কিছুতেই ফাদারের কাছে চার্চে থাকতে চাইলে না। ওঁদের সঙ্গে গেলে। আমাকেও ওঁরা সঙ্গে নিলেন। হয়তো ওঁদের শিকারের সময় আমি তোমার খেলার সঙ্গী হতে পারব মনে ভেবেছিলেন।

এলিনোরা বলল, হ্যাঁ, এবার ব্যাপারটা মনে পড়ছে। ওরা সব জঙ্গলের ভেতর কুঁড়েঘরখানাতে পোশাক পাল্টে কি যেন সব ডালপাতা কোমরে মাথায় পিঠে বেঁধে নিলে। বন্দুক হাতে বেরিয়ে যাবার সময় আমাদের দুজনকে ঘরের বাইরে যেতে বারণ করলে।

তিরাইয়া বলল, ওঁরা চলে গেলে আমরা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। ওঁরা ছোট্ট নৌকোতে উঠে এগোতে লাগলেন। পাখিগুলো ঝিলের জলে ভাসছিল। কিন্তু কেমন যেন সচেতন হয়ে গেল ওরা। হঠাৎ দেখলাম ঝাঁক ঝাঁক পাখি পাখা ঝাপটে উঠে পড়ল আকাশে। গুলীর আওয়াজ আমরা শুনতে পেলাম। অতি চীৎকারে আকাশ কাঁপিয়ে পাখিগুলো তখন পালাচ্ছে। ক'টা পাখি আমাদেরই চোখের সামনে গুলি খেয়ে ঝরে পড়ল ঝিলের পাশের খালে।

আমরা দুজনে দৌড়ে গেলাম খালের ধারে। খালের স্রোতে আহত মৃত পাখিগুলো তখন ভেসে চলেছে। কেউ বা অসহায়ভাবে ডানা ঝাপটাচ্ছে। সেই করুণ দৃশ্য তুমি সহ্য করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা নৌকো ছেড়ে উঠে এলেন খালের ধারে। পাখিগুলো ঝিলে পড়েনি, পড়েছিল খালে। ভেসে যাওয়া পাখিগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে ওঁরা আফসোস করতে লাগলেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম খালের জলে। স্রোতের সঙ্গে সাঁতার কেটে প্রায় সব কটা পাখিকেই ধরলাম। একটা পাখি ওদের ভেতর অক্ষত ছিল, কেবল ভয় পেয়ে পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে তোমার হাতে দিয়ে তবে কান্না থামালাম।

এলনোরা বলল, এখন সব মনে পড়ছে। সবাই সেদিন তোমার কৃতিত্বের জন্যে খুব প্রশংসা করেছিল।

তিরাইয়া হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা নোরা, তোমার মা-বাবা কেমন আছেন বললে না তো ?

এলনোরা বলল, আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড জিয়োভানীর কথা তুমি জানতে। তাঁর সঙ্গেই মা চলে যায়। সে অনেক দিনের কথা। বাবার সঙ্গে খুবই বচসা হত সে সময়।

মা চলে যাবার পর আমাকে কনভেণ্টে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বাবা আমাকে প্রায়ই দেখতে আসত। মা একবার মাত্র এসেছিল, মিঃ জিয়ো-ভানীর সঙ্গে নিউইয়র্ক চলে যাবার আগের দিন।

তিরাইয়া বলল, তোমার দুঃখের জায়গায় ঘা দিয়ে আমি বোধ হয় ভাল করলাম না নোরা !

এলনোরা বলল, আমার দুঃখের কাহিনীর এখনও শেষ হয়নি তিরাইয়া। কনভেণ্ট থেকে ঘরে ফিরে দেখলাম, এক নতুন বিধবা মহিলার আনাগোনা

চলছে আমাদের বাড়িতে।

বাবা ওকে বিয়ে করল। আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু মহিলাটির নীচতা দিনে দিনে আমার অসহ্য হয়ে উঠল। বাবা পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করে অসহায় হয়ে পড়ছে, তা আমি বুঝতে পারছিলাম। তাই আঙ্কেল-কে চিঠি লিখলাম সব জানিয়ে। উনি ডেকে পাঠালেন, আর আমি ওখান-কার হাঁফিয়ে ওঠা জীবনটাকে ছুঁড়ে ফেলে এখানে চলে এলাম।

এলিনোরা এবার অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, গীর্জাতে এসে আংকাম্মাকে দেখলাম না, নতুন একটি মেয়ে কিচেনের কাজ করছে। কি ব্যাপার?

তিরাইয়া বলল, গত বছর মা মারা গেছে।

এলিনোরা স্থির চোখে তিরাইয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে যেন কথাটা বিশ্বাসই করতে পারছে না। এই দীর্ঘপথ জার্নি করে আসার ফলে তীব্র একটা মাথার যন্ত্রণায় তাকে প্রায় পেড়ে ফেলেছিল। তখন কোন মানুষের খোঁজ নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখন কথাটা শুনে সারা চেতনা তার আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

এলিনোরা এক সময় বলল, আংকাম্মাকে আমি সেই ছোটবেলায় পাগলের মত ভালবাসতাম তিরাইয়া।

তিরাইয়ার মুখে শেষবেলার মরা আলোর মত একটা হাসি ফুটল। সে বলল, মা যখন তোমাকে আদর করত পাশে বসিয়ে, তখন আমার খুব রাগ হত।

এলিনোরা বলল, তোমার যত রাগ হত আমার তত জেদ চাপত। আমি তোমাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে আংকাম্মার বুকের কাছ ঘেঁষে বসতাম।

আমি তোমাকে টেনে দূরে সরিয়ে দিতে গেলে মা হঠাৎ তার হাতখানা তুলে আমাকে মারের ভয় দেখাত।

আর অমনি তুমি রাগে গজরাতে গজরাতে মুলিয়া বস্তির দিকে ছুটে চলে যেতে। কোন কোন রাতে ফিরতে না। আংকাম্মা কত রাত অবধি তোমাকে খুঁজে খুঁজে ফিরে আসত।

তিরাইয়া বলল, সে দিনগুলোর কথা বড্ড মনে পড়ে নোরা। মাকে কত ভাবনায় ফেলতাম মনে করলে এখন বড় কষ্ট হয়।

এলিনোরা বলল, তুমি একদিন এমনি চলে গেলে আমার বেশ মনে আছে আংকাম্মা তোমাকে মুলিয়া বস্তিতে খুঁজে এল। তারপর অনেক রাতে চার্চের ছাদে উঠে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। আমি শুতাম

ছাদের ঘরে আর আমার ডিভানের নীচে বিছানা করে শুত আং-কাম্মা। দরজা খুলে অনেক রাতে সামনের ছাদে আংকাম্মাকে বেরিয়ে যেতে দেখে আমি চুপি চুপি তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কতক্ষণ চাঁদের আলোয় সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে যখন পেছন ফিরল আংকাম্মা তখন আমাকে দেখতে পেল। আমি আংকাম্মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমি আর কখ্খনো তিরাইয়ার সঙ্গে ঝগড়া করব না আংকাম্মা।

আংকাম্মা আমার কথা শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাপড়ে চোখ মুছতে লাগল। এক সময় ডাইনের ঝাউবনের দিকে আঙুল তুলে বলল, দেখ, তিরাইয়া ঘুরছে।

আমি দেখলাম, সত্যি তুমি ঝাউগাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্রের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছ।

তিরাইয়া বলল, আমি রাগ করে বেরিয়ে আসতাম ঠিক কিন্তু রাতের সমুদ্র আর ঐ ঝাউয়ের বন আমাকে ঘরে ফিরতে দিত না। আমি কেমন যেন নিশি পাওয়ার মত ঘুরে বেড়াতাম।

এলিনোরা কৌতুকের হাসি হেসে বলল, এখনও তেমনি রাতে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আছে নাকি?

তিরাইয়া কিন্তু হাসতে হাসি ফেরাল না। মনের অতল থেকে সে বলল, এ আমার রক্তে আছে নোরা। শুনেছি, বাবাও কোন কোন রাতে কাউকে না বলে নৌকো নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ত। হয়ত মাকে ভাবিয়ে কাঁদিয়ে ফিরত দু'তিন-দিন পার করে দিয়ে। আর বাবার মৃত্যুটাও ঘটে-ছিল নাকি এমনি করে।

কি করে তিরাইয়া?

তিরাইয়া বলল, বাবার মত সাহসী নুলিয়া কেউ নাকি কোনদিন দেখে-নি। ডাঙায় বাবা যখন থাকত তখন মড়ার মত পড়ে থাকত ঝোপড়িতে। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে খেত, আর সারাক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমাত।

কিন্তু সমুদ্রে নামলে জ্ঞান থাকত না। দিন নেই, রাত নেই, টেপ্পায় চেপে চষে বেড়াচ্ছে সমুদ্র। সমুদ্দুর যেন তার খেলার মাঠ। মাছ ধরতে ওস্তাদ ছিল বাবা, কিন্তু মাছের নেশায় সমুদ্রে যেত না। বাবা নাকি ডাক শুনতে পেত সমুদ্রের। মা বলত, হঠাৎ রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে ছুটল বালির তীর ধরে কতদূর। সেখানে ঝাউবনের আড়ালে থাকত তার টেপ্-পা। সেটাকে জলে ঠেলে ভাসিয়ে উধাও হয়ে যেত। সমুদ্দুরের জলে

চাঁদের রূপালী কুচি কুড়োনোর লোভে, না ঢেউয়ের ওপর সওয়ার হয়ে চলার লোভে বাবা সমুদ্র চষে বেড়াত তা কেউ বলতে পারে না। মা কোন কথা জানতে চাইলেই বাবা হাসত, কিন্তু কোন রকম উত্তর তার কাছ থেকে নাকি পাওয়া যেত না।

এমনি এক রাতে বেরিয়ে বাবা আর ফিরল না। প্রায় মাসখানেক পরে তার নৌকোটা ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। কোথায় জান? ঐ দূরের ঝাউজঙ্গলের ভেতরে, যেখানে বাবা সবার চোখের আড়ালে তার টেপ্‌পাটা রাখত।

এলিনোরা বলল, আশ্চর্য তো!

ততক্ষণে ওদের দুজনের পেছনের আকাশে সূর্য ডুবে গেছে। কৃষ্ণা-দ্বাদশীর অন্ধকার বালির পাহাড়, বনঝাউয়ের জঙ্গল ডিঙিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অথৈ সমুদ্রের জলে।

তিরাইয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ফাদার নিশ্চয়ই এতক্ষণ চিন্তা করছেন তোমার জন্যে। চল, আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে যাই।

এলিনোরা উঠে দাঁড়াল, কিন্তু আলোচনায় ছেদ পড়ল না।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এলিনোরা বলল, তুমি সমুদ্র ভালবাস না তিরাইয়া?

—আমার রক্তে সমুদ্রের ডাক শুনতে পাই নোরা।

তিরাইয়ার মুখে কথাটা এমন গভীর গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হল যে চলতে চলতে চমকে উঠল এলিনোরা।

তিরাইয়া একটু থেমে আবার বলল, জান নোরা, মা আমাকে তাই নুলিয়া বস্তিতে রাখতে চাইল না। ফাদারের কাছে এনে ফেলল।

এলিনোরা বলল, তোমার মায়ের ভেতর কিন্তু আমি নুলিয়া বস্তির সাধারণ মেয়েদের কোন ছাপই দেখিনি।

তিরাইয়া বলল, আমরা তেলেগু নুলিয়া, কৈবর্ত, নাগগোত্র। রসুলপুর নদী বয়ে যে সব জেলে নৌকো ভেসে আসে দূর দূরান্ত থেকে তারা এ দেশীয়। আমার মা ঐ জেলেদের বাড়ির মেয়ে। আমার মামাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। নিজেদের নৌকো ছিল। আমাদের নুলিয়াদের মত টেপ্‌পা নৌকো নয়, নদীর ওপারের অন্ধ্রের নুলিয়াদের মত বড় পাড়োয়া নৌকো।

আমার মা ছোটবেলা থেকেই মা-বাবাকে হারিয়ে বড় ভায়ের কাছে

মেয়ের যত্নে মানুষ হয়েছিল। মাকে পড়তেও পাঠিয়েছিল মামা ইস্কুলে।

এলিনোরা কথার মাঝে মন্তব্য করে বলল, ভেরি ইন্টারেস্টিং।

তারপর মায়ের বিয়েটাও বড় অদ্ভুতভাবে হল।

এলিনোরা হঠাৎ তিরাইয়ার হাতখানা টেনে ধরে বলল, একটুখানি বসই না এই বালির ঢালে। দেরী যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তোমার মায়ের বিয়ের ব্যাপারটা একটু ভাল করে শোনা যাক।

তিরাইয়া বলল, কাহিনী কিছু বড় নয় নোরা। আমাদের নুলিয়াদের কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। নৌকোতে মেয়ে নিয়ে কখনো সমুদ্রে যেতে নেই।

এলিনোরা প্রতিবাদের সুরে বলল, কেন নেই? মেয়েরা কি মানুষ নয়?

তিরাইয়া বলল, অনেক দিনের চালু ব্যবস্থা। কেউ কোনদিন এর প্রতিবাদ করেনি, মেনে নিতেই অভ্যস্ত। মামার মুখে শুনেছি, আশ্বিন থেকে ফাল্গুন অবধি সমুদ্রে মাছ ধরার সময়টাতে এদেশী নুলিয়ারা শুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করে। নিজের বাড়িতে রাতে শোয় না। নদীর মুখে কোন ভাড়া বাড়িতে থাকে. ঘরে কেউ যদি ঐ সময়ে রাত কাটায় তাহলে তাকে ভোরে চান করে পূজো দিয়ে শুদ্ধ হতে হয়।

এলিনোরা বলল, অদ্ভুত নিয়ম।

তিরাইয়া বলল, এ নিষেধ না মানলে ওদের ধারণা, একটা কিছু বিপদ ঘটবে।

এলিনোরা বলল, তোমার মায়ের বিয়ের ব্যাপারটা কি হল?

তিরাইয়া বলল, মা একবার তার দাদাকে ধরল, সে-ও তার সঙ্গে বাহার গাঙে মাছ ধরা দেখতে যাবে। অনেক বোঝানতে যখন কোন ফল হল না, তখন মামা নৌকোর ভেতর লুকিয়ে মাকে নিয়ে যায়। যেন পাশাপাশি নৌকোর লোকেরা জানতে না পারে সেজন্যে দিনের বেলা মায়ের নৌকোর ওপরে ওঠা বারণ ছিল।

কিন্তু ঘটনাটা সত্যিই ঘটল। ফেরার পথে ঝড়ের মুখে পড়ে নৌকো ডুবে গেল। মামা জলের তলায় চলে গেল। কিন্তু একটা কাঠ ধরে ভাসতে লাগল মা। কখনো চেতন, কখনো আচ্ছন্ন। এমন অবস্থায় চাঁদের আলোয় বাবা দেখল মাকে। তুলে নিল টেপ্‌পার ওপর। তারপর নিজের গাঁয়ে না ফিরে বাবাকে বিয়ে করে মা থেকে গেল নুলিয়া বস্তিতে।

মায়ের চেহারায়, আচার-ব্যবহারে তাই তুমি এই নুলিয়া মেয়েদের থেকে

অনেক পার্থক্য দেখেছ। আর তাছাড়া ফাদারের কাছে থেকে মা অনেক মার্জিত হবার সুযোগ পেয়েছিল।

এলিনোরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সত্যি ইন্টারেস্টিং। চল এখন জোর পা চালিয়ে চার্চে ফেরা যাক।

পেছনে সমুদ্রের বাতাস প্রায় ওদের ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলল।

এলিনোরা বলল, পুরো একটি বছর তোমার মায়ের সঙ্গে আমি বেঙ্গলীতে কথা বলেছি। তাই আজও বেঙ্গলীতে কথা বলতে আমার বাধে না।

আমার মনে আছে সে সময় মায়ের সঙ্গে এ দেশীয় ভাষায় কথা বলার জন্য ফাদার তোমাকে খুব উৎসাহ দিতেন।

এলিনোরা চার্চের কম্পাউণ্ডে ঢুকতে ঢুকতে বলল, তাই বলতে পার, একদিক দিয়ে তোমাব মা আমার ভাষা শেখানোর গুরু।

সেদিনই বক্রেশ্বরের মহালে ফেরার কথা ছিল, কিন্তু বক্রেশ্বরের আর ফেরা হল না। মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে যেমন চিতাগুলো দূরে যেতে চায় না, বার বার একই জায়গায় ফিরে ফিরে আসে, ঠিক তেমনি তরুণীর গন্ধ পেয়ে সহসা চার্চ ছেড়ে নড়তে চাইল না বক্রেশ্বর।

ওরা ফিরে এল কয়েক ঝলক হাওয়ার সঙ্গে কিছু উড়ো বালি মেখে। ওরা এসে দেখল ফাদার সামনেব লনে নেই। তিরাইয়া একটু অবাক হল, কারণ ফাদার লনের চেয়ারে বসে সন্ধ্যে প্রায় সাতটা অবধি সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর উঠে প্রার্থনার ঘরে যান। ফিরে এসে ডায়েরী লেখেন। জমিদারী সেরেস্তার দু'একটি কর্মচারী চার্চের পেছনের ব্লকে কাজ করে। ফাদার তাদের ঘরে গিয়ে কিছু সময় কাটান। এরপর ঠিক সাড়ে ন'টা বাজলেই ডিনার টেবিলে চলে যান ফাদার। বাঁধা রুটিনের প্রায় নড়চড় হয় না। অবশ্য কোন অতিথি যেদিন আসেন সেদিন নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে।

তিরাইয়া লাইব্রেরী ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল ফাদার বসে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। লোকটি পেছন ফিরে বসে থাকার দরুন চেনা যাচ্ছে না।

এলিনোরা পোশাক বদলাতে ঘরে ঢুকল।

এ সময় তিরাইয়া কিছু পডাশোনা করে। ফাদারের লাইব্রেরী ঘরের একপাশে পাতা আছে তার চেয়ার। সামনের সেল্‌ফ থেকে বই টেনে নিয়ে সে পড়ে। সবই ধর্মগ্রন্থ। মায়ের কাছ থেকে বাংলা পড়ালেখাটা সে শিখে নিয়েছিল। ফাদার তাকে অনেক যত্নে শিখিয়েছেন ইংরাজী ভাষা। সে

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ফাদারের দাগ দেওয়া বাইবেলের অংশ থেকে বাংলায় ভাষান্তর করে। ফাদার যখন প্রচারের কাজে বাইরে বেরোন তখন সে ফাদারের সঙ্গী হয়ে বইপত্র বয়ে নিয়ে যায়। তাছাড়া বাইবেলের ঐ অনুবাদ করা অংশগুলো কপি করে গ্রামে গ্রামে তাকে বিলি করতে হয়।

তিরাইয়া হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিল। ধীরে ধীরে ঢুকল লাইব্রেরী ঘরে চোখচোখি হল বক্রেশ্বরের সঙ্গে। মৃদু হেসে সে বসল গিয়ে তার চেয়ারে।

তিরাইয়া জানে বক্রেশ্বর এমন একটি মানুষ যে কারো ক্ষতি করার সুযোগ পেলে মুহূর্তকাল বিলম্ব করে না। সুযোগকে কাজে লাগাতে তার মত দক্ষ দ্বিতীয় কোন মানুষ আজও চোখে পড়েনি তিরাইয়ার।

ফাদারের কাজে জঙ্গলমহালে গিয়ে সে ছোট-বড় বহু ঘটনা লক্ষ্য করেছে যার থেকে নায়েব কৈলাসপতি কিংবা তার ছেলে বক্রেশ্বরকে চিনে নিতে তার এতটুকুও অসুবিধে হয়নি।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, তিরাইয়াকে ওরা কোন রকম বুদ্ধিমান মানুষ বলেই গণ্য করত না। তাই ফাদারের আচার-আচরণ, তাঁর সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে ওদের বাধত না। তিরাইয়া প্রায় সব প্রশ্নের জবাবই এড়িয়ে যেত। সে এ বিষয়ে তার অজ্ঞতার কথাই ওদের জানাত। কিন্তু চোখ খোলা রেখে ওদের দুষ্কৃতির যত ছবিই সে দেখুক, ফাদারের কাছে ওদের নষ্টামীর কথা বলতে তার রুচিতে বাধত। কিন্তু যদি ও পক্ষের কোন অপকৌশলের আঁচ পেত তাহলে নিজের বুদ্ধি দিয়ে তার প্রতিকারের পথ খুঁজে বার করত। ফাদারকে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষার দায়িত্ব সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। ফাদারের ভালবাসার উত্তাপ প্রতিটি মুহূর্তে তাকে উষ্ণ করে রাখত। তাই কৃতজ্ঞতায় তার মন ছিল ফাদার আরেতিনোর ওপর কানায় কানায় ভরা।

তিরাইয়া একটি বই টেনে নিয়ে তার অসমাপ্ত অনুবাদের কাজটুকু করতে শুরু করল। লাইব্রেরী হলের অন্যপ্রান্তে অনুচ্চে কথা বলছিলেন ফাদার। বক্রেশ্বরের গলাটা মাঝে একটু উচ্চগ্রামে বেজে উঠেছিল। ঝাড়লণ্ঠনটা দুলছিল হাওয়ায়। নীচে এক টুকরো ছায়া ঘরভরা আলোর পেছনে দুষ্টু মেয়ের মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল।

ফাদারের গলা হঠাৎ বেজে উঠল, এসো নোরা, বক্রেশ্বরের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি।

তিরাইয়া তার পেছনে পায়ের সাড়া পেল। নোরা এগিয়ে যাচ্ছে ওদের দিকে। তিরাইয়া বইয়ের ওপর চোখ পেতে রইল। পেছনে তাকানো শিষ্টাচারের বাইরে, সে জানে।

একটা চেয়ার নড়ে ওঠার শব্দ এল তার কানে। তিরাইয়া বুঝল, বক্রেশ্বর সৌজন্য দেখানোর জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বসুন, বসুন,—নোরার মিষ্টি গলা আড়বাঁশির মত বেজে উঠল।

এবার চেয়ার নাড়ানাড়ি করে দুজনে বসতেই ফাদার বললেন, নোরা, আমার অভিভাবিকা, আর এ হল বক্রেশ্বর, বেপরোয়া এক উৎসাহী যুবক। কি, ঠিক বলিনি ? বলেই ফাদার হাসতে লাগলেন।

বক্রেশ্বর বলল, বিরাট গাছের আড়ালে যেমন আগাছারা আশ্রয় পায়, ঝড়-ঝাপটাকে তোয়াক্কা না করে দিব্যি বড়র প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠে, আমার অবস্থা ঠিক তাই, বলতে পারেন।

নোরার গলা শোনা গেল, পুরুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়বে, অন্যের আশ্রয়ের কথাই ওঠে না।

তিরাইয়া হঠাৎ চমকে উঠল। যদিও কথাটা তার উদ্দেশ্যে বলা হয়নি, তবু বুকের কোথায় গিয়ে যেন কথাটা বাজল। তার ঝিমানো রক্ত হঠাৎ একটা জোয়ারের ঢেউ লেগে চলকে উঠল।

ফাদার বললেন, দেখলে তো বক্রেশ্বর, নোরা পুরুষকে কিভাবে মর্যাদার চোখে দেখে।

মানছি ফাদার,—বক্রেশ্বর বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল, তবে একটা কথা আছে। মহতের সঙ্গ সব সময়েই ভাল, কারণ সেখানে এগিয়ে যাবার শক্তি পাওয়া যায়।

ফাদার বললেন, দেখলে তো নোরা, আমাদের বক্রেশ্বর কতখানি বুদ্ধি ধরে।

নোরা ওপথে আর এগোল না। সে বলল, মিস্টার, মিস্টার···

বক্রেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বলল, মণ্ডল।

লজ্জিত নোরা বলল, মিঃ মণ্ডল আপনি থাকেন কোথায় ?

আবার বক্রেশ্বরের গলায় বিনয়ের সুর বাজল, ফাদারের জঙ্গল মহাল আমার বাবা দেখাশোনা করে আসছেন বহুকাল। তাই ঐ জঙ্গল মহালেই আমরা মাথা গুঁজে রয়েছি।

নোরা বলল, জঙ্গল মহাল কাকে বলে ?

ওবার ফাদার কথা বললেন, ওটা চার্চের আর উপায়ের একটা জায়গা বলতে পার। সমুদ্র আর নদী যেখানে মিলেছে তারই পাশে জঙ্গল কাটিয়ে একসময় বসবাস শুরু হয়েছিল। খালে জঙ্গলে ভরা ঐ জায়গা তোমার বাবা এখানে এসে চার্চের জন্য কিনেছিল। এখন ওখানে চাষাভূষোর বসত হয়েছে। খালে-বিলে জেলেরা চার্চের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে মাছ ধরছে। আর ঐ সব জমিজায়গার বিলি-বন্দোবস্ত, আর উপায়ের হিসেব-নিকেশ করার ভার রয়েছে যার ওপর সে হল প্রভুর বড় অনুগত কৈলাসপতি। তুমি যার সঙ্গে কথা বলছ, সে হল আমাদের কৈলাসপতির একমাত্র ছেলে।

নোরা বলল, আমি তো ওখানে গিয়েছি তাহলে।

বক্রেশ্বর সবিস্ময়ে বলল, আপনি গেছেন জঙ্গল মহালে?

ফাদার বললেন, হ্যাঁ, তাই তো বটে, তুমি আগে একবার যখন এসেছিলে তখন শিকার পার্টির সঙ্গে গিয়েছিলে ওখানে।

নোরা বলল, ও অনেক দিনের কথা। জায়গাটা তখন বেশ ভাল লেগেছিল।

ফাদার একটু ভেবে বললেন, এখন একবার ঘুরে দেখে আসতে পার। এখনকার চোখে হয়তো আরও ভাল লেগে যেতে পারে।

বক্রেশ্বর অমনি বলে উঠল, বাবা খুব খুশী হবেন।

আমি ওখানে যেতে পারলে তাঁর চেয়েও বেশী খুশী হব। বিশেষ করে নদী, জঙ্গল আর সাধারণ মানুষ জনের আলাদা একটা আকর্ষণ আছে।

ফাদার বলে উঠলেন, দি আইডিয়া। শোন নোরা, বেড়াতে যাবার কথা উঠে ভালই হল। শুধু বেড়ানো নয়, তোমাকে কাজ নিয়ে যেতে হবে। আমি বহুকাল মহালে যেতে পারিনি। কৈল্যাসপতি বড় দুঃখ আর অভিমান করে। তুমি যাবে আমার প্রতিনিধি হয়ে। তাছাড়া অনেক বড় একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। ওখানকার আদিবাসী কিংবা অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেদের ভেতর প্রভুর বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা তোমাকে দেখতে হবে।

নোরা বলে উঠল, আমি রাজী আঙ্কেল। কাজটা আমার খুব ভাল লাগবে বলেই মনে হচ্ছে।

বক্রেশ্বর বলল, আমার সব রকম সাহায্যই আপনি পাবেন।

চার্চ থেকে মানুষ জঙ্গল মহালে গিয়ে নাক গলায় এটা পিতাপুত্রের কেউই চাইত না। তারা যা এনে দিত তাই যেন ছিল তাদের অনুগ্রহের দান।

কিন্তু তরুণী মেয়েটি বক্রেশ্বরের মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাই নোরার সান্নিধ্যের লোভ সে সামলাতে পারল না। তরুণীটিকে উত্তপ্ত আমন্ত্রণ জানিয়ে বসল জঙ্গল মহালে বেড়াতে যাবার জন্যে।

পরিকল্পনা মোটামুটি ঠিক হল। ফাদার বললেন, সেপ্টেম্বরের শেষ ক'টা দিন এখানেই থাক নোরা। প্রচারের ব্যাপারে প্রাথমিক কতকগুলো পাঠ ওর দরকার। অক্টোবরের ফার্স্ট উইকে ওকে আমি পাঠিয়ে দেব।

ফাদারের শেষ কথাটুকু মনঃপুত না হলেও গিলতে হল বক্রেশ্বরকে। নিটোল যৌবনের সমস্ত রসে ভরা এই কুমারী মেয়েটিকে সদ্য কাছে পাওয়ার রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা থেকে সে বঞ্চিত হল বলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক ঠেলে।

পরের দিন ভোরবেলা চায়ের আসরের শেষে নোরা বলল, আঙ্কেল, আমি আজ সমুদ্রে স্নান করব। সুইমিং কস্টিউম আমি সঙ্গে করেই এনেছি।

এ সব বিষয়ে ফাদারের কোন গোঁড়ামী নেই। ফাদার শুধু বললেন, এতখানি বালির পাহাড় টপকে যেতে না হলে আমিই যেতুম তোমার সঙ্গে। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয় এ বয়সে। তার চেয়ে তিরাইয়াকে সঙ্গে নাও, ও তোমাকে এই সমুদ্রের আণ্ডার কারেন্ট সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করে দেবে।

মনে মনে খুশী হল নোরা। মুখে বলল, তুমি সঙ্গে থাকলে খুব মজা হত আঙ্কেল।

ফাদার বললেন, তিরাইয়া খুবই নির্ভরযোগ্য। সমুদ্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন লোকের সঙ্গী হওয়া তোমার দরকার।

তিরাইয়াকে ডেকে নোরার ইচ্ছার কথাটা জানিয়ে দিয়ে ফাদার বল-লেন, দুরন্ত মেয়ে নোরা, কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে দুরন্তপনা চলে না। নোরা রোজ স্নানে যাবার সময়ে তুমি ওর কাছে থাকবে। দরকার হলে ওকে শাসন করবে।

ফাদার কথাটা বলে নোরার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। নোরা কপট প্রতিবাদের সুরে বলল, আমি মোটেও দুরন্ত নই আঙ্কেল। ছেলে-বেলার নোরাকেই তুমি দেখেছ, এখন তার কত পরিবর্তন হয়েছে তা তুমি জান না।

ফাদার হেসে বললেন, আমার কাছে তুমি সেই দুরন্ত নোরাই রয়ে গেছ।

ওরা নুলিয়া বস্তির দক্ষিণে বনঝাউ আর বালির সবচেয়ে বড় পাহাড়টার আড়ালে সমুদ্রস্নানে নেমেছিল। দিগন্তছোঁয়া সমুদ্র। অশান্ত আক্ষেপে

বার বার তীরে আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো। ক'টা গাংচিল পাখায় রোদ্দুর মেখে ঢেউয়ের কাছাকাছি বার বার নেমে আসছিল। নোরা হাঁটু অবধি জলে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় টালমাটাল হতে হতে পড়ে গেল। বুক ছুঁয়ে তার জল। আবার ঢেউ সরে যেতেই জল নেমে এল কোমরে। স্নানের পোশাক পালিশ করা পাথরের মূর্তির মত তার উদ্ধত যৌবনের প্রতিটি রেখাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছিল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে তিরাইয়া। তেলেগু নুলিয়াদের কালো নিটোল দেহের গঠন তার। সে তাকিয়েছিল নোরার দিকে। নোরা জলে গা ডুবিয়ে দোল খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে তাকাচ্ছিল তিরাইয়ার দিকে।

হঠাৎ নোরার মনে হল, খালি গায়ে তিরাইয়াকে অনেক সুন্দর দেখায়। তিরাইয়ার মুখে আর চোখে এমন এক অকৃত্রিম সবল সরলতা আছে যা তার কাছাকাছি যে-কোন মানুষের দৃষ্টি মুহূর্তে কেড়ে নেবে।

ও যখন কথা বলে তখন গভীর একটা সত্য ওর চোখের চাহনি আর ঠোঁটের সূক্ষ্ম কাজগুলির ভেতর প্রকাশ পেতে থাকে। নোরা ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিরাইয়ার মুখের ঐ ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে।

তিরাইয়া জানে না যে তার দেহের বলিষ্ঠতা আর মনের ঐ সহজ শক্তির মূল্য কতখানি। বোধহয় সচেতন নয় বলেই তিরাইয়া এত সুন্দর।

হঠাৎ তিরাইয়ার গলা শোনা গেল, আরও এগিয়ে যাও নোরা, ঢেউ ভাঙতে হলে অন্ততঃ বুক জলের কাছাকাছি সব সময় থাকতে হবে।

নোরা টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে খল খল খুশী ছড়াতে ছড়াতে জলের হালকা টানের ওপর দিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে চলল।

ঢেউ এল আবার। এতক্ষণ শাঁখের মত সাদা নিটোল দুটো পায়ের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিল, এবার তা ডুবে গিয়ে জল এল বুকের তলায়। ফেনার উচ্ছ্বাস তুলে আবার ঢেউটা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে জল সর্ সর্ করে সরে যাচ্ছে। সে টেনে নিয়ে চলেছে একটি ফুটন্ত তরুণীকে। নোরা জলের আকর্ষণ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে হেরে গেল। যেই হার মানল অমনি জল স্থির হয়ে যেন ওর নাভির আবর্ত ছুঁয়ে ঘুরতে লাগল।

আবার ঢেউ আসছে। মাথার ওপর আসছে অনেক উঁচু হয়ে। নোরা

কি করবে ভেবে পেল না। সেই মুহূর্তে তার মনে হল সে অতলে তলিয়ে যাবে। ঢেউ এসে পড়েছে বিপুল উচ্ছ্বাসে। একি! কে তাকে মাটির স্পর্শ থেকে মুহূর্তে তুলে ধরল ঢেউয়ের একেবারে চূড়োয়? ঢেউ ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল অদূরে বেলাভূমিতে আর নোরা ফিরে পেল পায়ের তলায় মাটি। জল আবার তার বুকের তলায় গিয়ে পড়েছে।

তার কোমর ছেড়ে দিয়ে তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিরাইয়া।

ওর গলা বেজে উঠল জলের শব্দের ওপরে, নোরা ঢেউ দেখলেই ভয় পেয়ো না। ঢেউ যখন না ভেঙে উঁচু হয়ে আসবে তখন ঢেউয়ের ওপর লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করবে। অবশ্য ঢেউয়ের সঙ্গে নিজেকে মাখিয়ে নিয়ে। আর যখন তোমার সামনে ঢেউ ভেঙে যাবে, জল এগিয়ে আসবে তোড়ে তখন তুমি ঐ ভাঙা ঢেউয়ের তলায় ডুব দেবে। তখন দেখবে ঢেউয়ের ওপারে তুমি দিব্যি মাটি ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছ।

এগুলো শুধু অভ্যাসের ব্যাপার। ধর আমার হাত, আমি ক'টা ঢেউ ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি।

বলতে বলতেই ঢেউ এগিয়ে আসতে লাগল তাল তাল হয়ে গড়াতে গড়াতে।

তিরাইয়া নাচের ভঙ্গীতে নোরার কোমরখানাতে হাত রেখে বলল, সোজা লাফিয়ে ওঠ নোরা।

চোখের পলকে দুজনে উঠে গেল ঢেউয়ের চূড়ায়। ঢেউ সরে গেলে জল গেল কমে। ওরা দাঁড়াল মাটি ছুঁয়ে।

কয়েকটা গড়ানে ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে নোরার যেন নেশা ধরে গেল। সারা শরীরটাকে তার এক অন্ধশক্তি বিপুল আবেগে তুলে ধরে প্রবল বেগে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। তার রক্তস্রোত শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে প্রবাহিত হয়ে ঐ লোনা জলের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। তার সমস্ত রোমকূপ এক অনাস্বাদিত উত্তেজনায় শিউরে শিউরে উঠছে।

এখন ঢেউ ভাঙতে সে নিজেই এগিয়ে যাচ্ছে। ঢেউয়ের পরে ঢেউ, আরও ঢেউ। এক একটা দুর্ধর্ষ ঘোড়ার ওপর লাফিয়ে উঠে সে মুহূর্তে তাদের বাগ মানাচ্ছে। নেশায় মেতে মস্ত বড় একটা ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল নোরা হঠাৎ তাকে তীব্র বাঁধনে পেছন থেকে বেঁধে নিয়ে ভাঙা ঢেউয়ের তলায় ডুবে গেল তিরাইয়া। জলের তলায় কোটি কোটি শাঁখের আওয়াজ শুনতে শুনতে এক সময় ঢেউয়ের ওপরে

ভেসে উঠল দুজনে।

তিরাইয়া ওকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ঢেউ ভাঙতে গিয়ে তুমি এখনি বুকে ধাক্কা খেয়ে কাড়গোড ভেঙে বসতে। এ ঢেউয়ের ওপরে উঠতে নেই, তলায় তলিয়ে যেতে হয়। চল আজ ফিরে যাই। প্রথম দিনেই তুমি এতকিছু শিখে ফেললে আমার যে আর শেখাবার কিছু থাকবে না।

শেষের কথাটা বলে হাসতে হাসতেই ওকে জড়িয়ে ধরে একটা বিশাল ঢেউয়ের ওপর উঠে গেল তিরাইয়া। তারপর ঢেউয়ের স্রোতের বেগে দু-জনে একেবারে তীরে এসে আছড়ে পড়ল।

সমস্ত ব্যাপারটার আকস্মিকতায় প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল নোরা, কিন্তু নিরাপদ বালির জমিন স্পর্শ করে সে হঠাৎ হাসি ছড়াতে লাগল।

তিরাইয়া ওকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলে নোরা ওর হাত ধরে টেনে রাখল।

ওরা দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছে। নোরা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। একটা মাদক হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে।

তিরাইয়ার মুখ অনেকটা ভাবলেশহীন। সে যেন তার ওপর ফাদারের অর্পিত কর্তব্যটুকু করতে পেরেই খুশী।

নোরা দেখল, তিরাইয়ার মুখে হাসি কিন্তু চোখে কোন ঘোর নেই। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তার মাথার আবরণটা খুলে ফেলল। অমনি এক-রাশ সোনালী ফণা তোলা সাপ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কাঁধের ওপর।

সে আর কোনদিকে না তাকিয়ে ভেজা বালিতে পায়ের দাগ ফেলে ফেলে বনঝাউয়ের জটলার দিকে চলল।

তিরাইয়া ওর ভাবান্তরটুকু লক্ষ্য করল না। সে একটা ভায়োলেটের ছিটে লাগা বড় ঝিনুক কুড়িয়ে পেয়েছিল। সেটাকে মাটিতে পুঁতে রেখে গিয়েছিল বালির ভেতর। এখন ঝিনুকটাকে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল নোরার দিকে।

নোরা ততক্ষণে বনঝাউয়ের তলায় পা ছড়িয়ে বসে কয়েকটা সী-গালের পাখা মেলে ওড়া দেখছে।

পাশে গিয়ে দাঁড়াল তিরাইয়া। নোরা হঠাৎ খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠল। একটা সী-গাল ঢেউয়ের বুকে ছোঁ মেরে মনে হল একটা রূপোলী মাছ তুলেছে।

তিরাইয়া বলল, তোমার লাকটা খুব ভাল নোরা, একটা সুন্দর ঝিনুক

কুড়িয়ে গেয়েছি।

ভিরাইয়া নোরার হাতে ঝিনুকটা দিতেই নোরা ভদ্রতা দেখানোর ভঙ্গীতে বলল, ধন্যবাদ।

ভিরাইয়া নোরার এই নিরুত্তাপ ধন্যবাদটুকু আশা করেনি। সে ভেবেছিল ঝিনুকের রঙ দেখে নোরা ঐ ঢেউগুলোর মতই খুশীতে ফেটে পড়বে। কিন্তু সে রকম কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে সে নোরার মেজাজটাকে দুর্জ্ঞেয় বলে ভাবতে লাগল।

নোরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার ফেরা যাক্।

ওরা বালিতে পা ডুবিয়ে উঠছে ওপরের দিকে। নোরা আগে, পেছন পেছন ভিরাইয়া। নোরাকে দেখছে ও, সঙ্গে সঙ্গে ওর হ্রস্ব ছায়াটাকে।

রাতে চার্চের পাশে ঝাউগাছটা শন্ শন্ একটা সুর ভাঁজছিল। ঘুম এল না নোরার চোখে। সে চেয়ে রইল বালিয়াড়ী আর সমুদ্রের দিকে।

মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ রাতের নীরবতাকে আচমকা ধাক্কায় নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। চাঁদ উঠেছে আকাশে। ঝকঝকে চাঁদ। বর্ষা শেষে শরতের চাঁদটা যেন সদ্য রূপোলী পালিশ খেয়ে বেরিয়ে এসেছে। পাতলা দুধের মত গলিত জ্যোৎস্না বালিয়াড়ি থেকে সমুদ্র অবধি ধুয়ে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে নোরার মনে হল, দূরের ঝাউবনের ভেতর কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে।

ও ব্যালকনিতে উঠে এল। বুক অবধি আলসেতে ঢাকা। নোরা চেয়ে রইল মানুষটার দিকে।

লোকটি এবার ঝাউবন পেরিয়ে নামল গিয়ে সমুদ্রে। ওকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল, আবাব হারিয়ে যাচ্ছিল চোখের ওপর থেকে।

নোরা ফিরে এল ঘরের ভেতর। সে পেছনের দরজাটা খুলে পা টিপে টিপে উঠল ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে। চার্চের চুড়োয়, যেখানে ঘণ্টা ঝুলছে, তার ঠিক পেছনের ছোটঘরটাই ভিরাইয়ার।

সে জানালা দিয়ে উঁকি মারল ঘরের ভেতর। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ভিরাইয়া ঘর খুলে কখন বেরিয়ে গেছে। আর নিশি পাওয়ার মত এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাউবন, বালিয়াড়ি আর সমুদ্র চবে।

হঠাৎ কেন জানি না আংকামম্মার উদ্বেগটা নোরার বুকে মোচড় দিয়ে

উঠল।

অনেক রাতে ফিরল ভিরাইয়া। চাঁদটা অথন ঝাউবনের আড়ালে লাল হৃৎপিণ্ডের আকার নিয়ে আটকে আছে।

নীচে নেমে নিজের শোবার ঘরের দরজার কপাটে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল নোরা। ওর সামনে দিয়েই ওপরে চলে যাচ্ছিল ভিরাইয়া। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

নোরার গলা বেজে উঠল, সারা রাত সমুদ্রের গান শুনে বেড়ালে?

থমকে দাঁড়াল ভিরাইয়া। অন্ধকারে আবছা একটা মূর্তি যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল ভিরাইয়া, তুমি জেগে!

তোমার কাণ্ডগুলো দেখছিলাম।

ভিরাইয়া বলল, বলেইছি তো ও রোগ আমার রক্তে। একেবারে প্রভুর কাছে চলে যাবার আগে ও আমাকে ছাড়বে না।

ফর গড্‌স্ সেক, আর কথা বাড়িও না। রাত পোহাতে বেশী বাকি নেই, দয়া করে শুতে যাও।

ভিরাইয়া কোন কথা বলল না। সিঁড়িতে তার উঠে যাওয়ার খস্ খস্ একটা আওয়াজ শোনা গেল।

নোরা শুনল ভেজান দরজা খোলা আর বন্ধ করার আওয়াজ। সে নিজের দরজা বন্ধ করে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। এতক্ষণ একটা উদ্বেগে সে অস্থির হয়ে পড়েছিল, এখন উৎকণ্ঠার কোন কারণ না থাকায় দারুণ রকম স্বস্তি বোধ করতে লাগল। গভীর ঘুম কিন্তু নামল না তার চোখে। একটা তন্দ্রাচ্ছন্নতা হেমন্তের ছড়িয়ে পড়া পাতলা কুয়াশার মত তার চেতনাকে ঢেকে ফেলছিল। একটা ছবি ফুটে উঠছিল রূপালী পর্দার বুকে। সে আর ভিরাইয়া পাশাপাশি বসে দেখছে সে ছবি। আশ্চর্য এ ছবির দৃশ্য, পাত্রপাত্রী সবই যে তাদের চেনা। দেখা ছবি যেন দু'বার করে দেখছে তারা। সমুদ্রে ঢেউ ভাঙছে দুটি তরুণ-তরুণী, ওরা পৃথিবী, সময়, আর ওদের পরিচয় ভুলে গেছে। মাতাল ঢেউগুলোর ওপর চড়ে তলায় ডুবে ওরা যেন লুকোচুরির খেলা খেলছে।

একসময় বড় একটা ঢেউ ওদের দুজনকে তালগোল পাকিয়ে ফেলে দিয়ে গেল ভেজা বালির জমিনে। ওরা সেখানে শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগল। পাখিরা পরস্পর যে ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করে ওরা সে রকম ভাষায় নিজেদের ভাব প্রকাশ করছিল। চাঁদ যেমন করে কোন হাত না

বাড়িয়েই সমুদ্রের আঁচল ধরে টানে আর অমনি উথলে পড়া দুধের মত জোয়ার উথলায় সমুদ্রের বুকে, ঠিক তেমনি ওরা পরস্পর হাত না বাড়িয়েও দুজনকে দারুণ রকম টানছিল।

সারা শরীরে একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল। অভাবিত কিছু একটা ওদের ভেতর ঘটে যাবে, এমনি একটা সুনিশ্চিত ধারণা দর্শক আসনে বসে নোরা আর তিরাইয়ার মনে যখন জেগে উঠল ঠিক তখন কোথা থেকে যেন শোনা গেল একটা ঘন্টার ধ্বনি। ওরা উঠে দাঁড়াল। ক্রমাগত ঘন্টাটা বেজে চলেছে।

ওদের এখন পরিচিত পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে তারই নির্দেশ।

নোরার ঘুম ভেঙে গেল। চার্চের বড় ঘন্টাটা একটানা বেজে চলেছে। ও জানে, এ ঘন্টা তিরাইয়ার হাতের টানেই বাজে।

নোরা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বাইরে চেয়ে দেখল, তার সোনালী চুলের মত সকালের রোদটুকু বালির জমিনে লুটিয়ে পড়ে আছে।

নোরা আজ নিজেই একবার বেরোল সমুদ্রের ধারে। ঝাউবন বাঁয়ে রেখে এসে দাঁড়াল সমুদ্রের ভেজা বালির ওপর।

রাশি রাশি লাল ফুল ছড়িয়ে পড়ে আছে তার চারদিকে।

সে ভাল করে চেয়ে হাত বাড়াতে যেতেই সব ফুল ম্যাজিকের মত মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল তার চোখের ওপর থেকে।

নোরা উঠে দাঁড়াল। অমনি ফুটে উঠছে এক একটি করে ফুল। আবার লাল ফুল বিছিয়ে দিল কোন্ জাদুকর সোনালী সিল্কের শাড়ির ওপর।

খেলাটা বুঝে নিয়েছে নোরা। লাল ফুলের রূপ ধরে ছোট ছোট এক জাতের কাঁকড়া বালির গর্ত থেকে বেরিয়ে স্থির হয়ে আছে। একবার একটুখানি আওয়াজ পেলেই চোখের পলকে সিঁধোয় গর্তের ভেতর। চিকু-রের মত ঝলক দিয়েই আঁধার।

বাতাস বইতে শুরু করেছে। খির্ খির্ করে বালি উড়ছে। সাঁই সাঁই শব্দে ঝাউপাতাগুলো যেন ঝেঁটিয়ে চলেছে চরাচরের বালি।

নোরা দেখল, নুলিয়া বস্তির দিকে সমুদ্রের জলে একপাল পুঁচকে ছোঁড়া ব্যাঙের মত বার বার ড্রাইভ দিয়ে পড়ছে। ন্যাংটো কালো কালো চেহারা-গুলো সাদা ফেণার কণ্ট্রাস্টে বেশ ফুটে উঠেছে।

সমুদ্রের খানিকটা জায়গা জুড়ে কে যেন ছড়িয়ে রেখেছে ভাঙা আয়নার কুচি। রোদ্দুর পড়ে চক্ চক্ চমকাচ্ছে। নুলিয়াদের কাছেপিঠে দেখা

যাচ্ছে না কোথাও। চার্চের ভোরবেলার ঘন্টা শুনে সেই যে বেরিয়েছে ওরা, ফিরবে দুপুর গড়িয়ে। এরপর দিনরাত্রির বিশ্রাম। কেউ তাড়ি গিলবে, কেউ বসবে জুয়ায় আড্ডায়। কোন গোঁফ-উঠতি ছোকরা ছুকছুক করবে ঝোপড়িগুলোর আনাচে-কানাচে ছনছনে লাউডগার মত বেড়ে ওঠা ডাগর মেয়েগুলোর গায়ের গন্ধে গন্ধে।

নোরার চোখ ঝাউবনের দিকে ফিরতেই চোখাচোখি হল একটা মেয়ের সঙ্গে। বালির ঢিবির আড়ালে কোমর অবধি ঢাকা পড়েছে। বুকের ওপর পাক খেয়ে পড়ে আছে একচিলতে ছেঁড়া ধূসর কাপড়। চুলে তেল বা চিরুনী কোনটারই ব্যবহার হয়নি অনেক দিন। হাওয়ায় চুল উড়ছে গাল কপাল আর কাঁধ ছুঁয়ে। মেয়েটির চোখ দুটো কেমন যেন করুণ করুণ। কালো মাজা মুখ। অভাবে বিষণ্ণ।

নোরা ওকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল।

মেয়েটি একটু চঞ্চল হল। কিন্তু বালির ঢিবি পেরিয়ে আসতে ইতস্তত করল।

আবার ওকে হাত ইশারায় কাছে আসতে বলল নোরা।

এবার মেয়েটি বালির ঢিবি পেরিয়ে নীচে নামল। নোরা দেখল হাঁটুর সামান্য নীচ অবধি নেমেছে ওর কাপড়। অনেকগুলো ছোট-বড় গিঁট দিয়ে কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ওর লজ্জা।

নোরা ওর দিকে এগিয়ে গেল। বলল, কি নাম তোমার?

কুনি।

থাক কোথা?

মেয়েটি নুলিয়া বস্তির দিকে হাত তুলে দেখাল না। সে খাঁড়ির দিকে ইংগিত করল।

নোরার মনে হল মেয়েটির বয়েস চোদ্দ-পনেরোর কম নয়, যদিও অভাব অপুষ্টির ছায়া ছড়িয়ে আছে দেহের সর্বত্র।

কি করছিলে তুমি ওখানে?—নোরা জানতে চাইল।

মেয়েটি কাপড়ের দিকে দেখিয়ে বলল, ঢিবির আড়ালে বসে গিঁট লাগাচ্ছিলাম।

লোকালয়ের মাঝখানে, এমনকি নিজের ঝোপড়িতে তার একখানামাত্র লজ্জাবস্ত্র সারিয়ে নেবার উপায় নেই, তাই কুনিকে একটা প্রকৃতির আড়াল খুঁজে নিতে হয়েছে। যেখানে তার সমগোত্রের কোন মানুষের চোখের দৃষ্টি

তাকে সঙ্কোচে পীড়িত করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে না।

নোরা প্রশ্ন করল, কে আছে তোমার বাড়িতে ?

বাবা।

আর কেউ ?

কুনি মাথা নেড়ে জানাল তার ঝোপড়িতে আর কেউ নেই।

নোরা বলল, তোমার বাবা কি ভোরবেলা নৌকা নিয়ে বেরিয়েছে ?

কুনি তার জটপাকানো চুল সমেত মাথাটা নেড়ে জানাল, তার বাবা মাছ ধরতে বেরোয়নি। মুখে বলল হাঙরে বাবার হাত কেটে নিয়েছে, তাই বাবা নৌকো চালাতে পারে না। ঝোপড়িতে বসে বসে দড়িতে পাক দেয় আর মাঝে মাঝে খাঁড়িতে শুত্‌লি ফেলে কাঁকড়া ধরে।

কুনি এগিয়ে এল নোরার কাছে। কোমরের কাপড় থেকে বের করল হরেক রকম ঝিনুক। হাতের মুঠো ভরে এগিয়ে ধরল নোরার দিকে।

নোরা দারুণ খুশী হয়ে বলল, ভারি সুন্দর তো। কিন্তু আমার কাছে তো এখন কিছু নেই ভাই যাতে তোমার ঝিনুকের দাম দিতে পারি।

কুনি মাথা নেড়ে জানাল এর জন্যে সে কিছু চায় না।

নোরা বলল, তা হয় না, তুমি বরং বিকেলের দিকে এসো চার্চে, আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই।

তারপর কি ভেবে বলল, তুমি তিরাইয়াকে চেন ?

কুনি প্রবল বেগে মাথাটা কাত করে জানাল, সে তিরাইয়াকে বিলক্ষণ চেনে।

নোরা বলল, দুপুরে ও নুলিয়া বস্তির পাশে চার্চের দাওয়াইখানাতে আসবে। আমি খানিকবাদে ওখানে আসব। তুমি ওখানে আমার সঙ্গে দেখা কর।

কুনি বলল, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব মেমসাহেব, তবে ঝিনুকের জন্যে পয়সা নেব না।

নোরা এই গরীব শতছিন্ন একখানা কাপড় পরা মেয়ের মনের জোর দেখে অবাক হয়ে গেল।

সে মিষ্টি হেসে বলল, আচ্ছা না হয় না নেবে, এস তো ওখানে।

মেয়েটা মাথা নাড়ল, তারপর পায়ে পায়ে সেখান থেকে চলে গেল।

নোরা দেখল মেয়েটির গড়ন সুন্দর, যদিও অভাবের চাবুকে সে বিক্ষত!

মেয়েটি চলে গেলে নোরার আর সমুদ্রতীরে বেড়াতে ভাল লাগল না।

সে সিধে বালি ভাঙতে ভাঙতে চার্চে এসে হাজির হল।

আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করছিল তিরাইয়া। নোরা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ সকাল সকাল?

তিরাইয়া ঘোড়াটাকে ততক্ষণে আস্তাবল থেকে টেনে এনে ঝাউগাছের তলায় দাঁড় করিয়েছে।

সে নোরার দিকে চেয়ে বলল, অতিথি এসেছে, তাই স্পেশাল মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে টাউনে যাচ্ছি।

নোরা মুখ টিপে হেসে বলল, ফিটন নিয়ে যাচ্ছ? আমিও যাব নাকি তোমার সঙ্গে?

তিরাইয়া বলল, হুকুম মিলবে না। একাই যাচ্ছি সওয়ার হয়ে।

নোরা বলল, জাস্ট এ মিনিট প্লীজ।

নোরা দৌড়ে চার্চের ভেতর ঢুকে গেল। তিরাইয়া চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ওর চলার ছন্দটুকু।

খানিক পরে ফিরে এসে ওর হাতে ক'টা টাকা দিয়ে নোরা বলল, টেকসই দেখে দুখানা মেয়েদের কাপড় নিয়ে এস।

তিরাইয়া অবাক, বলল, তুমি পরবে?

নোরার মুখে কৌতুকের হাসি। বলল, পরি যদি ক্ষতি কি? যে দেশে এসেছি, সে দেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে তো।

তিরাইয়া আর কিছু বলল না। হঠাৎ নোরার মনে হল, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছে তাকে তিরাইয়া। এ দেশের ভাষা সে শিখেছে আগেই, এখন পোশাকটা যদি এ দেশের পরে তাহলে ক্ষতি কি?

সে বলল, তুমি আমাকে ভাল একটা কথা মনে করিয়ে দিলে তিরাইয়া। আরও দুখানা কাপড় এই সঙ্গে এনো, আমি পরব।

তিরাইয়া বলল, আগের দুখানা?

নোরা বলল, তোমার অতশত কথায় কাজ কি। তবে দুখানা কাপড় বেশ মোটা টেকসই দেখে আনবে।

তিরাইয়া বলল, তোমার দুখানা রঙীন না সাদা আনব?

নোরা বলল, সাদাই আমার পছন্দ। তবে যেরকম ভাল বুঝবে তেমনি এনো। তোমার পছন্দ হলে আমারও হবে, আগাম কথা দিয়ে রাখছি।

তিরাইয়া ঘোড়ার ওপর বসে বলল, বেলা হল, আসি।

ঘোড়ার মুখ রাস্তার দিকে ফিরিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে আবার থামল তিরাইয়া। ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, শোন নোরা, আজ ফিরতে দেরী হবে। একা একা আবার যেন চলে যেও না সমুদ্রে স্নান করতে। তার চেয়ে আজকের দিনটা এখানেই স্নান সেরে নিও।

নোরা চেঁচিয়ে মাথা দুলিয়ে বলল, সে আমি বুঝব।

তিরাইয়া ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ফাদার আরেতিনোর খুঁটিনাটি সব কাজের ভার নিজের হাতে তুলে নিল এলিনোরা। বলল, এবার থেকে আঙ্কেল তুমি আমাদের কাছে প্রভু যীশু সম্বন্ধে তোমার অনুভূতির কথা বলবে। কিন্তু তোমার চার্চের আর আর সব কাজের জন্যে এখন থেকে আমরাই ভাবব।

ফাদার শিশুর মত একমুখ হাসি হেসে বললেন, তুমি যখনই এসেছ, তখনই বুঝেছি, আমার কাজের দুনিয়ার চাবিটা তোমার হাতেই যাবে।

নোরা আজ আর সমুদ্রে একা একা নাইতে গেল না। কিন্তু স্নানের ঘরে নাইবার সময় তিরাইয়ার সঙ্গে সমুদ্রে ঢেউ ভাঙার কথা তার খুব মনে পড়তে লাগল। তিরাইয়া কেমন করে তার কোমর আর হাতখানা ধরে ধরে ঢেউয়ের চূড়ায় উঠতে সাহায্য করেছিল, কেমন করে আচমকা পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা ঢেউয়ের তলায় ডুবে গিয়েছিল, সে সব কথা মনে পড়তেই সারা শরীর শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

নোরার মনে পড়ে গেল ভোরবেলাকার স্বপ্নের কথা। তিরাইয়ার সহজ সুন্দর দৃষ্টি যেন নোরার স্নানলীলা দেখছে, এমনি একটা অনুভূতি তার সারা শরীরে সলজ্জ একটা রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দিলে।

দুপুরে একরাশ বাজার নিয়ে ফিরে এল তিরাইয়া।

চার্চে ঢুকে প্রথম যার সঙ্গে দেখা, সে নোরা।

তিরাইয়া বলল, কাজগুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে ফিরে আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু এত কেনাকাটা যে ইচ্ছে থাকলেও পারা গেল না।

নোরা বলল, তুমি যে অন্তত তাড়াতাড়ি ফিরতে চেয়েছিলে এ জন্যে ধন্যবাদ। এখন আমার কাপড়গুলো এনেছ কি?

আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, তবে পছন্দ হবে কিনা বলতে পারি না।

নোরা বলল, তোমার দেশের মেয়েদের কাপড় সম্বন্ধে আমার কোনরকম ধারণা থাকার কথা নয়, তাই তোমার পছন্দই আমার পছন্দ।

খাওয়া-দাওয়ার পর নির্দিষ্ট নিয়মে নুলিয়া বস্তির দিকে বেরিয়ে গেল তিরাইয়া। হাতে ব্যাগ। হোমিওপ্যাথি ওষুধে ভর্তি। চার্চের পত্তনের দিন থেকে এ ব্যবস্থা চালু। মানুষের সেবার জন্যে চার্চ থেকে তার সামর্থ্যের ভেতরে যতটুকু করা যায়।

কিছু পরে প্যাকেটে কাপড় নিয়ে তিরাইয়ার দাওয়াইখানার দরজায় এসে হাজির হল নোরা। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল, তিরাইয়া সম্ভবত একখানা ডাক্তারী বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে একমনে।

নোরা পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল। কিন্তু নিবিষ্টতায় কোনরকম চিড় খেল না তিরাইয়ার। নোরা তিরাইয়ার মগ্নতায় আশ্চর্য হল, খুশীও হল।

এক সময় বই থেকে চোখ তুলতেই তিরাইয়া দেখতে পেল নোরাকে।

বেঞ্চটা দেখিয়ে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে যে, বোস।

নোরা বেঞ্চে বসে বলল, ডাক্তারের রোগীদের দেখছি না তো?

তিরাইয়া হেসে বলল, বসেই দেখ না, ডাক্তারের পসার কতখানি?

প্রথম যে এল সে রোগী নয়। সে প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল দাওয়াইখানার বাইরের দেয়াল ঘেঁষে। বালির ওপর চললে পায়ের শব্দ বেজে ওঠে না। তাই কুনির আগমন কেউ টেরই পেত না যদি না নোরার চোখ পড়ত ওর দিকে।

নোরা বাইরে বেরিয়ে কুনির হাত ধরে টেনে আনতে গিয়ে দেখে কুনি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার ঐ পোশাকে তিরাইয়ার সামনে বেরোবে না।

নোরা মুহূর্তে ব্যাপারটা আঁচ করে নিল। সত্যি এমন অবস্থায় কোন পুরুষের সামনে যাওয়া অসম্ভব। তারা নিজেরা অনেক সময় অনেক খাটো পোশাক পরে, কিন্তু সে পোশাক তাদের আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ণ করে না। কুনির পোশাকে দারিদ্র্যের দৈন্যটুকু শুধু ফুটে উঠেছে।

নোরা কুনিকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভেতর এসে ঢুকল। তিরাইয়ার দিকে চেয়ে আদেশের ভঙ্গীতে বলল, একটু বাইরে যাও তো দেখি। বাইরে বেরিয়েই কিন্তু কোনদিকে না তাকিয়ে চলে যাবে। বেশী দূরে যেতে হবে না, তবে আমি না ডাকলে ঘরের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে এস না যেন।

তিরাইয়া কোন কিছু জানতে চাইল না। সে নোরার নির্দেশ মত কাজ করল।

নোরা পেছন থেকে বলল, ইউ নটি বয়, না ডাকলে ঘরের দিকে ফিরে তাকাবে না কিন্তু।

তিরাইয়া যেতে যেতে বলল, দয়া করে আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে আমার হতভাগ্য রোগীদের ফিরিয়ে দিও না যেন।

নোরা বলল, তোমার রোগীরা প্রভুর ইচ্ছায় আজকের দিনটা ভাল থাকুক, এই মুহূর্তে তাদের এখানে আসার দরকার যেন না হয়। তবে একান্তই যদি এসে পড়ে, তাহলে ডাক্তার যে তার ডাক্তারী করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না এটুকু কথা দিতে পারি।

নোরা বাইরে বেরিয়ে এসে দেয়ালেঃ আড়ালে লুকিয়ে থাকা কুনিকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ওরা দুটিতে যখন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দাঁড়াল তখন কুনির চোখে জল। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ভেঙে বর্ষা নেমেছে। এদিকে কিন্তু নোরা নিজের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। সে নিজেকে যেন চিনতেই পারছে না।

নোরা কুনিকে বলল, কাল থেকে চার্চের ধোয়া-মোছাব কাজ করবে তুমি। খেতে পাবে, আর তোমার বাবার খাবারটাও নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু কাজটা বিনে মাইনের।

কুনি মাথা নেড়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ ধরে চলে গেল।

নোরা ডাকল তিরাইয়াকে। তিরাইয়া ফিরে দাঁড়িয়ে তো অবাক। এ কাকে দেখছে সে? সাদা কাপড লাল পাড, মাথার সোনালী চুলে পিঠ ঢাকা। এ দেশীয় অভিজাত বাডির কোন কোন মেয়েকে দেখার সুযোগ হয়েছে তার, কিন্তু এমন সুন্দর সে কাউকে দেখেনি।

কাছে এগিয়ে আসতেই নোরা হেসে বলল, তোমার দেশের মেয়ে হয়ে গেলাম তিরাইয়া। সারাটা জীবন যাদের সঙ্গে কাটাতে হবে তাদের আচার আচরণ মানব না, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরব না, এ তো হয় না।

তিরাইয়া বলল, সত্যি বড সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে শাডিতে।

নোরার মুখে তৃপ্তি আর গর্বের একটা হাসি ফুটে উঠল।

নোরা হঠাৎ বলল, আমি এখন চার্চে ফিরে যাচ্ছি তিরাইয়া।

তিরাইয়া বলল, আসতেও যেমন তাডা তোমার, যেতেও তেমনি। এখন যেতে চাইছ যাও, কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাবে কি?

নোরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিরাইয়ার মুখের দিকে তাকাল।

তিরাইয়া বলল, এমন করে শাড়ি পরতে শেখাল কে?

নোরা বলল, এ দেশের একটি মেয়ে।

কে সে?

নোরা ঝাঁঝিয়ে উঠল, সব কিছুতে ছেলেদের কৌতূহল! নামে কি এসে যায়?

তিরাইয়া বলল, ঠিক আছে। আমি মেয়েটির নাম জানতে না পারলেও এটুকু অনুমান করতে পারি টেকসই দুটো শাড়ি তারই ভাগ্যে জুটেছে।

নোরা হাসল। বলল, তোমার অনুমান ঠিক তিরাইয়া। তবে এখন শাড়িটা পেল কে তার সম্বন্ধে একটা অনুমান. কর দেখি।

তিরাইয়া একটু ভেবে বলল, নুলিয়াদের সব মেয়েই অভাবগ্রস্ত। তাই বিশেষ করে কারো নাম করা বড় মুশকিল।

নোরা আবার জোর দিয়ে বলল, তবু?

ওর নিজের আসনে বসে তিরাইয়া চুলে আঙুল চালাতে চালাতে সামান্য সময় কী যেন ভাবল। এক সময় নোরার মুখের দিকে চেয়ে বলল, কুনি। কুনি নামের একটি মেয়ে হতে পারে।

নোরা আবেগে তিরাইয়ার হাত ধরে নাড়া দিতে দিতে বলল, কি করে জানলে তুমি তিরাইয়া? আমি তো তোমাকে বলিনি, আর তুমিও তো ওকে দেখনি।

তিরাইয়া বলল, অনুমান। তবে বলতে পার সার্থক অনুমান।

নোরা বলল, নিশ্চিত মানছি, তবুও কিন্তু কৌতূহল মিটল না।

তিরাইয়া বলল, নুলিয়া বস্তিতে তুমি আগে আসনি, এই প্রথম এলে। তাই আমার সামনের নুলিয়া বস্তির কোন মেয়ে যে তোমার নজরে পড়বে এমন বলা যায় না। ভাবলাম, তাহলে কে বিদেশিনী করুণাময়ী নোরার মন জয় করতে পারে!

কথার মাঝে বাধা দিয়ে নোরা বলল, আদপেই আমি করুণাময়ী নই।

তিরাইয়া বলল, তখন আমার চোখের ওপর একমাত্র কুনির মুখখানাই ভেসে উঠল। কুনি থাকে চার্চের ওপারে বালিয়াড়ির নীচের খাঁড়িতে। সে এত দুঃস্থ যে করবার মত কিছু কাজ তার হাতে নেই। তার বাবা নরসমলু হাঙরের কামড়ে ডান হাতখানা খুইয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। তোমার ঘুরে বেড়ানোর পথে কোন এক সময় ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

নোরা বলল, ঠিক তাই। ও আমাকে সমুদ্রের ধারে বেড়ানোর সময় ওর কুড়োনো কিছু ঝিনুক উপহার দিয়েছিল। দাম নিতে চায়নি। তাই আমিও ওকে কাপড় উপহার দিলাম।

তিরাইয়া বলল, সবচেয়ে অভাব ঐ কুনির অথচ কোন দিনই ও মুখ ফুটে কারো কাছে কিছু চায় না।

নোরা অমনি বলল, তাই নিজে সেধে ওকে চার্চের কাজে বহাল করেছি।

তিরাইয়া বলল, কুনি কোথায়? দেখছি না তো?

ও চলে গেছে। নতুন কাপড় পরে মেয়েটা কাঁদছিল। বোধহয় ওর ভাগ্যকে ও বিশ্বাস করতে পারছিল না।

তিরাইয়া বলল, তোমাকে নিশ্চয় কুনিই শাড়ি পরার কৌশলটা শিখিয়ে দিয়ে গেছে।

নোরা মাথা ঝাঁকাল, হাসতে লাগল।

তিরাইয়া বলল, আজ সন্ধ্যায় কিন্তু এখানে কুনির হাজির থাকার কথা।

নোরার চোখে-মুখে প্রশ্নচিহ্ন ফুটে উঠল।

তিরাইয়া বলল, অর্জুনা ছোঁড়াটা কুনিকে বড় জ্বালাতন করে। ভর-সন্ধ্যায় কুনির ঘর ছেড়ে বেরোবার উপায় নেই। সুতলি থেকে সন্ধ্যেবেলা কাঁকড়া ছাড়াতে গেলেই অর্জুনা গন্ধে গন্ধে চলে আসবে। ঠিক ওর পেছু নেবে। ঘ্যান ঘ্যান করে হাজার কথা বলে যাবে।

নোরা বলল, ছেলেটাকে শাস্তি দিতে পার না?

তিরাইয়া বলল, প্রতি শুক্রবার বিচারসভা বসে এখানে। আগে ফাদার নিজেই আসতেন, এখন আমাকে পাঠিয়ে দেন। আজ বিচারের দিন।

নোরার গলায় কৌতুক, তোমাকে মানে এরা? আমি হলে তো মানতাম না।

তিরাইয়া বলল, মানে কিনা দেখবই না।

দুপুরে দু-চারটি মেয়ে আর হাঁপানি রোগী জনাকয়েক বুড়ো-বুড়ি এল। তিরাইয়া ওদের রোগের বিবরণ শুনে লক্ষণ বিচার করে ওষুধ দিতে ওরা চলে গেল।

সারা দুপুরে আর কেউ নেই। সমুদ্রের সেই একটানা আওয়াজ আর দূরের ঝাউবনের শন্ শন্ শব্দ শুনতে শুনতে তিরাইয়ার মনে হল, প্রকৃতি তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাষায় আক্ষেপ প্রকাশ করছে।

নোরা তার পাশে বসে থাকতে থাকতে বলল, কাজ নেই কথা নেই, জমে যে একেবারে পাথর হয়ে গেলাম।

তিরাইয়ার ধ্যান ভাঙল। সে বলল, দুঃখিত, এতক্ষণ তোমাকে একা বসিয়ে রেখেছি। বলতে পার এটা এক ধরনের অভদ্রতা।

না তা কেন বলব। তুমি কোন কিছু নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে ভালবাস আর আমি সারাক্ষণ ভালবাসি হাত-মুখ নেড়ে কাজকর্ম করতে, কথা বলতে।

তিরাইয়া বলল, নোরা, আমার সারাক্ষণ মনে হয়, ঐ সমুদ্রে পড়ে থাকি। জলজন্তুরা যেমন জলের প্রবাহে দোল খায় আমিও তেমনি সারা দিনভোর দোল খাই।

তুমি কবি তিরাইয়া। নেচারের সঙ্গে মিলেমিশে তুমি এক হয়ে গেছ। একটু থেমে আবার বলল নোরা, কবিদের আমি ভালবাসি, কারণ একমাত্র কবিরাই ভালবাসতে জানে।

তিরাইয়া বলল, নোরা তুমি সুন্দর, তোমার ভাবনাও সুন্দর, তাই কবিকে একমাত্র তুমিই আবিষ্কার করতে পার।

নোরা এবার কোন কথা না বলে তিরাইয়ার দিকে চেয়ে রইল। তিরাইয়া প্রথমে অস্বস্তিবোধ করল। তারপর ডাক্তারী বইখানার পাতায় চোখ রাখল। কিন্তু ওর মন দূর থেকে উড়ে-আসা এক চিত্রিত প্রজাপতির নাচ দেখতে লাগল।

বাইরের জলো হাওয়ায় একটা করুণ বৈকালী রাগিণী শুরু হল। দুটি তরুণ তরুণী বসে রইল একটা চালাঘরের ভেতর। ওরা কোথাও গেল না, কোন কথা উচ্চারণ করল না, তবু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে যৌবনের শ্রেষ্ঠ কথা গুলো বলে গেল।

আজ শুক্রবার, তাই রোগীর ভিড় দুপুরের দিকে একটু কম। অনেকে বিচার আচারের জন্যে আসে, সেই সঙ্গে রোগটাও দেখিয়ে যায়।

তিরাইয়া এক সময় বলল, নোরা তুমি চার্চে চলে যাও। এখন বিকেলের চায়ের সময় হয়ে গেছে। ফাদার তোমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

তুমি যাবে না?—নোরা জানতে চাইল।

তিরাইয়া বলল, শুক্রবার যে আমার কোথাও নড়ার উপায় নেই নোরা।

ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। ফাদারকে চা দিয়ে ফ্লাস্কে আমাদের দুজনের জন্যে নিয়ে আসব। এইখানে বসে খাব।

তিরাইয়া হেসে বলল, কি পাগলামী তোমার নোরা।

তাই হল। নোরা চলে গেল চার্চের দিকে আর ওর চলে যাওয়ার ছন্দটুকু দেখতে লাগল তিরাইয়া।

তিরাইয়ার মনে হল, নোরা বড বেশী ভাবপ্রবণ। একটুতেই ভেঙে পড়া ঢেউগুলোর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ তার মনে আর একটা চিন্তা এল। যে ঢেউ তীব্রবেগে ভেঙে পডছে সেগুলোই আবার সমান টানে দুরন্ত বেগে সরে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। তাই তীব্র আবেগের আনন্দের সঙ্গে একটা করুণ পরিণতির সুরও বাজে।

দুটো রোগী এল। পেটের ব্যথায় কাতর একটি। কোনরকমে কাতরাতে কাতরাতে এসেছে। অন্যটি নির্বাক, তার কানের গোডা ফুলেছে। কথা বলতে গেলেই চোয়ালে টান পডে লাগছে। তাই তার অসুখ সম্বন্ধে অনেক কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারছে না।

তিরাইয়া পেটেব রোগীটির খবর নিয়ে জানল, সে ইতিমধ্যেই নুলিয়া-পাডার মতানুযায়ী তুকতাকগুলো সেরে এসেছে। অর্থাৎ কিছু চাল ঢেলে তার চারদিকে গোলগণ্ডী দিয়ে চালের ওপর ঢ্যাবা কেটেছে। তার ওপর হাত চাপিয়ে একখণ্ড পাথর ধরে রেখেছে। কিন্তু অনেক ডাক হাঁকেও হাতের পাথর নডেনি।

কথাটা বলতে গিয়ে জোয়ান নুলিয়াটার চোখে জল এসে গেল। পাথর নড়লে সে নির্ঘাৎ ভাল হত, কিন্তু যেহেতু পাথর নডেনি সেইহেতু রোগটা যে তার দুরারোগ্য এ সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

তিরাইয়া তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, ওষুধে বিশ্বাস রেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কানের রোগীটি বেদনায় প্রায় নিবাক। আকারে ইংগিতে তার অসহায় অবস্থাটা প্রকাশ করতে লাগল।

তিরাইয়া বলল, সাগরের ফেনা নুনে গুলে লাগিয়ে কি উপকার পেলে না?

লোকটা মাথা নেডে জানাল, কোন উপকারই হয়নি।

তিরাইয়া তাকে ওষুধ দিয়ে বলল, বিশ্বাস রেখো, ফল পাবে।

ওরা চলে যেতে না যেতেই দাওয়াইখানায় এসে ঢুকল বছর আঠারো-উনিশের একটা ছেলে। বেশ বলিষ্ঠ, হাতে একটা শঙ্কর মাছের চাবুক।

চাবুকখানা তিরাইয়ার সামনের টেবিলে রেখে বলল, তোমার জন্যে আনলাম।

তিরাইয়া প্রথমে কোন কথা বলল না। ছেলেটা একটু দূরে মাটির ওপর বসে তিরাইয়ার দিকে পিট্ পিট্ করে তাকাতে লাগল।

তিরাইয়া তার দিকে কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বাজের মত গলায় বলল, তুই কুনির পেছনে আবার লেগেছিস?

চমকে উঠল ছেলেটা, তারপর ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তিরাইয়ার পায়ে।

কুনিকে না পেলে আমি মরে যাব তিরাইয়া দাদা। তুমি আমাকে মেরে ফেল ঐ চাবুক মেরে, তবু কুনিকে আমি ভুলতে পারব না।

তিরাইয়া বলল, ও যখন সুতলি থেকে কাঁকড়া ছাড়াতে গিয়েছিল, তখন তুই তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিলি?

অর্জুনা মিথ্যে বলার ছেলে নয়। সে মাথা নেড়ে জানাল কথাটা সত্যি।

তিরাইয়া এবার রূঢ় গলায় বলল, হারামজাদা তুই তার কাপড়টা হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে দিয়েছিলি?

এবার চুপ করে রইল অর্জুনা। শঙ্কর মাছের চাবুকখানা নিয়ে সপাসপ আগাপাস্তলা ওকে চাবকাতে লাগল তিরাইয়া।

বলতে লাগল, এই তোর কুনিকে ভালবাসার নমুনা। হারামজাদা, মেয়ে মানুষের ইজ্জৎ রাখতে জানিস না।

মুখে কথা নেই, চাবুকের ঘা খেয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে উঠছে অর্জুনার জোয়ান দেহখানা।

হঠাৎ ছেলেটা বলে উঠল, আমাদের বেলা যত দোষ, কেন তুমি যখন চার্চের মেমসাহেবকে জড়িয়ে নিয়ে ঢেউয়ের তলায় ডুবেছিলে, তখন দোষের হয় না।

থেমে গেল তিরাইয়ার হাত। একটা জাতসাপ যেন এই মুহূর্তে তাকে ছোবল মেরেছে। কোন কিছু করার নেই। অসহায়ভাবে একটা গভীর যন্ত্রণার ভেতর তলিয়ে যাওয়া ছাড়া।

অর্জুনার দিকবিদিক জুড়ে চোখ। সে হয়তো কুনির ঝোপড়ির দিকে যাওয়ার পথে ওদের স্নানের দৃশ্যটা দেখে থাকবে।

তিরাইয়া জানে, ভাল করেই জানে, নোরাকে সমুদ্রস্নানে তালিম দেবার

সময় তার করণীয়টুকুই সে করেছে। মনে তার কর্তব্য ছাড়া কোন গ্লানিই ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে ছোবল দেওয়া সাপটাকে সেকথা বলার কোন অর্থ হয় না। সে তার বিষ ঢেলে দিয়ে বসে আছে।

তিরাইয়া হাতের চাবুকখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। এত জোরে ছুঁড়ল যে বাতাসে সাঁক করে একটা শব্দ ভেসে উঠল।

অর্জুনা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের একটা কোণে, সমস্ত শরীরটা তার দেওয়ালের দিকে ফেরানো। শুধু ঘাড়ের পাশ দিয়ে তাকিয়ে আছে তিরাইয়ার দিকে।

হঠাৎ চোখ পড়ল তিরাইয়ার বাইরের দিকে। চার্চের এলাকা পেরিয়ে অনেক কষ্টে কাপড়খানা সামলে এদিকে আসছে নোরা। ডান হাতে তার ফ্লাস্ক।

তিরাইয়া চেয়ারে বসে পড়ে অর্জুনাকে ডাক দিতেই সে ভয়ে ভয়ে টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াল।

তিরাইয়া বলল, কুনির সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি, তবে দুটো শর্তে।

অর্জুনা চেয়ে আছে। তার চোখে কি কৃতজ্ঞতার ছায়া নামল।

তিরাইয়া বলল, কি, রাজি?

অর্জুনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

তিরাইয়া বলল, প্রথম, জুয়ার আড্ডায় যেতে পারবি না। বিয়ের পর ওপথ মাড়ালেই কিন্তু আমি বালি খুঁড়ে পুঁতে ফেলব তোকে।

অর্জুনা বলল, কিরা নিচ্ছি তিরাইয়া দাদা, ও পথ আমি আর মাড়াব না।

আর দু'নম্বর কথা হল, কুনির বাপের খোরাক-পোশাকের ভার তোকে নিতে হবে।

দ্বিতীয় শর্তটায় সায় দেবার আগে বেশ কিছু সময় ভাবনার ভেতর ডুবে রইল অর্জুনা।

একসময় বলল, আমার আপত্তি নেই, তবে বুড়োটা বাড়ির পাশে আমাকে দেখলেই রাতদিন শেয়ালের মত খ্যাঁক খ্যাঁক করে।

তিরাইয়া ধমকে উঠল, না, তোকে ফুল ছুঁড়ে পুজো করবে। গেছিস মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে আর মেয়ের বাপ তোকে আদর করে ঘরে বসাবে। মেরে ফাটায়নি তোর পিঠ, এই রক্ষে।

অর্জুনা বলল, মেরে দেখুক না একবার। বুড়োকে তাহলে দড়ি বেঁধে হাঙরের পেটে দিয়ে আসব না।

তিরাইয়া বলল, তোর যেরকম মেজাজ দেখছি, তাতে কুনি তোর ঘর করতে পারবে বলে মনে হয় না। প্রথম চটক কেটে গেলে মনে হয় তুই হারামজাদা কুনিকে ঠ্যাঙাবি।

অমনি তিরাইয়ার পা ধরে বসে পড়ল অর্জুনা।

ক্ষমা করে দাও দাদা, কোন্ বেল্লিকের বাচ্চা আর কুনির বাপকে নিয়ে কথা বলে।

তিরাইয়া বলল, ওঠ, কুনি এখুনি আসবে, তার মতটা একবার জিজ্ঞেস করি।

অর্জুনা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, তাহলেই হয়েছে। কথাটা কানে গেলেই ও ফোঁস করে উঠবে। তার চেয়ে দাদা তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও। আমি কুনির বাপকে খাতির করে খাওয়াব। মাইরি বলছি। এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি গালছি। তখন ব্যাগড়বাঁই দেখলে এক লাথি কসিয়ে দিও আমার কাঁকালে।

তিরাইয়া বলল, ওঠ, আমি বেঁচে থাকতে যদি দেখি তুই শেয়ালের মত এঁকে বেঁকে চলছিস, তাহলে ঐ লোনা জলে তোর মুখখানা চুবিয়ে রাখব, যতক্ষণ না তোর দমটা বেরিয়ে যায়।

অর্জুনা উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, রাজী।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল নোরা। আর ছিটকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল অর্জুনা।

তিরাইয়া ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, ভাগ্ হারামজাদা, কাল ঠিক দুপুরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করিস।

অর্জুনা মনের খুশীতে এক আঁজলা বালি হাতে তুলে নিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। তারপর ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে পার হয়ে গেল বালির প্রান্তর।

নোরা বলল, ছেলেটা কে?

তোমার প্রিয় কুনির ভাবী বর।

নোরা অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে দেখে তিরাইয়া ওকে ঘটনাটা বুঝিয়ে বলল।

নোরা ভারী খুশী। বলল, তাহলে কুনির জন্যে আরও কিছু খরচ করতে হবে।

তিরাইয়া বলল, কুনির ভাগ্য ভাল, তোমার মন সে জয় করতে পেরেছে।

প্রধান বিচার ছিল কুনিকে নিয়ে, সেটার ফয়সালা হয়ে গেল, তাই মুলিয়াদের পঞ্চায়েৎ আর জমল না।

ওরা উঠে গেল, আর ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে চাঁদটা একটা মিষ্টি মেয়ের মত একঝলক হাসি ছড়িয়ে দিলে।

তিরাইয়া বলল, চল নোরা আজ আমাদের পাড়ায় তোমাকে নিয়ে যাই।

নোরা বলল, আমাকে পর করে দিচ্ছ কেন তিরাইয়া? এখন থেকে এ মুলিয়া পাড়াটা শুধু তোমারই নয়, আমারও।

তিরাইয়া ওর দিকে চেয়ে হাসল। এত অল্প সময়ে একটি মেয়ে কি করে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পরিবেশকে এমন নিজের বলে ভাবতে পারে তা সে বুঝে উঠতে পারল না।

ওরা কথা বলতে বলতে মুলিয়া বস্তির দিকে এগিয়ে চলেছিল।

নোরা বলল, তোমরা কি এই অঞ্চলের মানুষ? টাউন পেরিয়ে আসার সময় যাদের দেখেছি তাদের সঙ্গে তোমাদের চেহারার কিন্তু একেবারেই মিল নেই।

তিরাইয়া বলল, আগেই একদিন তোমাকে বলেছিলাম, আমরা তেলেগু মুলিয়া। দক্ষিণসাগরের তীর ধরে পূবদিকে সরতে সরতে গোপালপুর হয়ে এখানে এসে পড়েছি। তা এখানেও আমাদের ক'পুরুষ হয়ে গেল।

নোরা বলল, এরা তো শুনেছি পৌত্তলিক।

তিরাইয়া বলল, আমি খ্রীষ্টান ধর্ম নিলেও এরা আমাকে ত্যাগ করেনি। পুজো করে জলের দেবী অর্চ্চীর। নতুন নৌকো জলে ভাসাতে গেলেই দেবী অর্চ্চীর পুজো দিয়ে শুক্রবারে ভাসাতে হবে। ঠিকই ধরেছ, এরা পৌত্তলিক।

নোরা বলল, শুনেছি ইণ্ডিয়ানদের পুজোর অদ্ভুত সব নাকি অনুষ্ঠান আছে?

তিরাইয়া বলল, মুলিয়াদের অর্চ্চী পুজোর অনুষ্ঠানটাই ধরা যাক্। সমুদ্রের ধারে ন'টি পিণ্ড তৈরী হবে বালি দিয়ে। তাতে ছড়ানো হবে সিঁদুর। আস্ত একটা নারকেল তার সামনে রেখে ফুল আর কলা দিয়ে পুজো করা হবে। তারপর আগুনে পোড়ানো হবে তিনটে মাছ। একটা

ভাসিয়ে দেওয়া হবে সমুদ্রের জলে, অন্য ছুটো পূজোর প্রসাদ হিসেবে ভাগ করে খাবে সবাই।

বড পাডোয়া নৌকো মাঝদরিয়ায় নিয়ে যায় সাবাড জেলেরা। ওরা তিরিশ চল্লিশখানা নৌকো একসঙ্গে নিয়ে যায়। তিন চার মাস সমুদ্রে একনাগাডে থেকে মাছ ধরে। ইলিশ মাছের মরশুমে ওরা বড ব্যস্ত থাকে। ওদের খাবার-দাবার দিয়ে আসে হপ্তায় হপ্তায় মহাজনেরা।

যা বলছিলাম, ঐ সব পাডোয়া নৌকোর পূজার সময় মুর্গী ছাগল বলি দিতে হয়। নৌকোর মাথায় বেশ করে সিঁদুর মাখিয়ে দিতে হয়। জেলেগুমানারী পুরুভরা আসে ঘটা করে পূজো দিতে।

ওরা সমুদ্রের ধার দিয়ে নুলিয়া বস্তির দিকে হাঁটছিল। বাতাসে শুট্‌কী মাছের গন্ধ ভেসে এল।

তিরাইয়া বলল, আমরা এখন মাছের খটির পাশ দিয়ে চলেছি। দেখছ না দডিতে ঝুলছে মাছ। ঐ শুকনো মাছ চালান দেওয়া হবে বাইরের শহর বাজারে।

নোরা বলল, এই এত বড জালটা বালিতে পডে রয়েছে কেন?

ওটা ইর্‌গা জাল। পাশাপাশি ছুটো নৌকোতে দাঁডিয়ে চারটে লোক সমুদ্রে এই জালটাকে টেনে নিয়ে যায়। জালের মাঝে মাঝে থাকে কাঠের টুকরো, জালটাকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে। জালটা শুকুতে দেওয়া হয়েছে। সারাইও চলবে সঙ্গে সঙ্গে।

নোরা বলল. খুব বড বড মাছ বুঝি এ জালে ধরা হয়।

বড মাছ ধরার জাল হল, সিঙ্কি জাল। চেলা, ম্যাকরেল ইলিশ, করাত ধরার জাল ওটা।

কথা বলতে বলতে ওরা ঢুকল নুলিয়া বস্তির প্রথম ঝোপড়িতে।

একটা গুন গুন সুর ভাঁজাচল যেন কেউ। নোরা মুখে আঙুল দিয়ে তিরাইয়াকে কোন কথা বলতে বারণ করল।

ছডার একটা সুর এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল,

কোকা অস্তনাদি তুংগ তুংগ
পিল্লি অস্তনাদি তুংগ তুংগ
গেদ্দা অস্তনাদি—
অটকেল পতাদি তুংগ তুংগ।

নোরা চুপি চুপি বলল, কিসের গান?

তিরাইয়া বলল, এরাম্‌মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

কি বলছে ও?

তিরাইয়া ব্যাখ্যা করে বলল, সব জায়গাতেই ছেলেদের বোধহয় ভয় দেখিয়েই ঘুম পাড়ানো হয়। এখানে মা বলছে, কুকুর আসছে, বেড়াল আসছে, ঘুমোও বাবা ঘুমোও। বড় পাখি এসে তুলে নিয়ে যাবে, ঘুমোও বাবা ঘুমোও।

'পল্লি অস্তনাদি তুংগ তুংগ' আবৃত্তি করতে করতে নোরা ঝোপ্‌ড়ির ভেতর তিরাইয়ার সঙ্গে ঢুকে পড়ল।

অক্টোবরের মাঝামাঝি এক পড়ন্ত বেলায় এলিনোরা আর তিরাইয়া নদী পার হয়ে এসে দাঁড়াল এক ফাঁকা প্রান্তরে। খেয়া নৌকো এ পারের দু'-চারটি পারার্থীকে তুলে নিয়ে চলে গেল ওপারে। দিনের শেষ খেয়া।

নদীর ওপর দিয়ে বয়ে আসছিল একটা শিরশিরে হাওয়া। হোল্ডল-খানা পিঠে তুলে হাতে সুটকেশ নিয়ে সামনের দিকে এগোতে গিয়ে বাধা পেল তিরাইয়া।

নোরা বলল, খেয়ার ওপার পর্যন্ত কুলি মালপত্র বয়ে এনেছে, তাতে অসুবিধে কিছু নেই, কিন্তু এপারে এসে সবকিছু দুজনকে শেয়ার করে নিতে দাও।

তিরাইয়া বলল, আমি অবাক হচ্ছি ঝিলমহাল থেকে কেউ না আসার জন্য। চিঠি তো অনেক অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে। কৈলাসপতি কি চিঠি পাননি?

নোরা বলল, তাই সম্ভব, নইলে বক্রেশ্বর ঘোড়া নিয়ে ঠিক হাজির হত খেয়াঘাটে।

তিরাইয়া বলল, যদিও আজ অনেক রাত অবধি চাঁদ পাব আমরা তবু ঝিলমহাল এখান থেকে পাকা পাঁচমাইল পথ। এটুকু পথ হেঁটে যেতে তোমার খুবই অসুবিধে হবে।

নোরা বলল, একটুও না, আমি বেশ এনজয় করতে করতেই যাব।

তিরাইয়া বলল, বৃষ্টি অনেকদিন শেষ হয়ে গেলেও এদিকের মাটির পথ অনেক জায়গায় মানুষ আর পশুদের চলার জন্য এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে। তোমার বোঝা নিয়ে চলতে অসুবিধে হবে নোরা।

নোরা বলল, কনভেন্ট পড়ার সময় আমরা যখন পাহাড়ী জায়গায়

এস্কিকারসানে যেতাম তখন আমাদের পিঠে বাঁধা থাকত মস্ত বড় বোঝা। তাই নিয়ে নুড়ি পাথর বাঁচিয়ে চলতে হত আমাদের। ওসবে মোটামুটি অভ্যেস আছে আমার।

সুটকেশখানা তিরাইয়ার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল নোরা।

চলতে চলতে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, নদীর ওপারে পথের দুধারে ধানের গাছ দেখলাম, কিন্তু এপারে ধূ ধূ করছে কেন প্রান্তর? কোন গাছপালা, ঝোপঝাড়ের চিহ্ন নেই।

তিরাইয়া বলল, এখানে নদীর জল লোনা, কারণ একেবারে কাছেই সমুদ্র। আর ঐ নদীর লোনা জল জোয়ারের সময় কুল ছাপিয়ে ওঠে! অনেক দূর অবধি লোনা জল খেলে বেড়ায়। তাই নদীতীরের বেশ খানিকটা জায়গাতে কিছুই জন্মাতে পারে না।

সূর্যাস্তের লাল রঙ ঘোলাটে হয়ে মুছে যেতে না যেতেই আকাশে ফুটে উঠতে লাগল চাঁদের আলো। ধীরে ধীরে আলোর জ্যোতি বাড়ল। একটা শীতল স্নিগ্ধতামাখা সে আলো। ওরা চলতে লাগল জ্যোৎস্না-ধোয়া নির্জন পথে।

কিছুদূর এসে লোনা জলে ধোয়া প্রান্তরটাকে ওরা ছাড়াল। ওদের ছায়া এখন ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। একটা বটগাছ বিপুল ডালপালা ছড়িয়ে শীতল রাতের স্তব্ধতাকে আলিঙ্গন করছে।

নোরা বলল, দারুণ ভাল লাগছে পথ চলতে, তবে এখানে একটু বসা যাক।

পিঠের বোঝা নামিয়ে তিরাইয়া বসল তার পাশে।

কতক্ষণ ওরা কোন কথা বলতে পারল না। ওরা চেয়ে রইল জ্যোৎস্না-প্লাবিত দিগন্তের দিকে। সবুজ ধানের গাছগুলো অল্প অল্প হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে। ঠিক যেন ঢেউ উঠছে সবুজ সমুদ্রে।

নোরা বলল, তোমার দেশ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় তিরাইয়া। এমন আলোর খেলা, এমন সবুজের ঢেউ আমি আর কোথাও দেখিনি।

তিরাইয়া বলল, এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ আমি কেন সুযোগ পেলেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসি।

নোরা হেসে বলল, তুমি দুষ্টুমি করার জন্যেই বেরোও। নইলে ঘুম কামাই করে রাতে কেউ বেরোয়?

তিরাইয়া বলল, মোটেও তা না। সবকিছু ভালবাসি বলেই আমি চারদিকে ছুটে বেড়াই বলতে পার, তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াই।

নোরা বলল, আর পালিয়ে গিয়ে অন্যকে কাঁদাও। যখন ছোট ছিলে তখন আংকামৃমাকে কাঁদিয়েছ। এখন বড় হয়েও অন্যকে ভাবনায় ফেলার খেলা তোমার ভাঙেনি।

তিরাইয়া বলল, আমাকে ভুল বুঝ না নোরা। আমার চলা ফেরার ওপর আমার নিজের শাসন আমি অনেক সময় হারিয়ে ফেলি।

নোরা বলল, নিজে যদি নিজেকে শাসন করতে না পার তাহলে শাসনের ভারটা ছেড়ে দাও আর কারো ওপর।

তিরাইয়া হেসে তাকাল নোরার দিকে।

নোরা বলল, চল, এগোই সামনের পথে। কত রাতে যে পৌঁছব কে জানে।

নোরা কিন্তু উঠল না। তিরাইয়া উঠে দাঁড়িয়ে বেডিংটা পিঠে তুলতে যাচ্ছিল, তার হাত ধরে টেনে বসাল নোরা।

বলল, আচ্ছা এমন সুন্দর রাতটাকে একটু না দেখে ভারী ভারী বোঝা নিয়ে চলতে ইচ্ছে করবে তোমার?

তিরাইয়া আবার হেসে তাকাল খেয়ালী নোরার দিকে।

ওরা পাশাপাশি বসে দুজনে দুজনের মত ভাবতে লাগল।

নোরা ভাবল, একটা সরল, মসৃণ ইউক্যালিপটাস গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। গাছ আপন মনে বাতাসে দুলছে। সে যে বসে আছে তাকে ছুঁয়ে সে দিকে ইউক্যালিপটাস গাছটার কোন খেয়ালই নেই।

গাছটার ওপর রাগ হয়, তবু ওকে ছেড়ে যেতে পারা যাবে না। বড় ভালবেসে ফেলেছে সে গাছটাকে।

আচ্ছা, পাশে বসে থাকা এই ঋজু দেহের যুবকটিকে সে যদি বিয়ে করে তাহলে কেমন হয়? ও ঠিক ঐ ইউক্যালিপটাস গাছটার মতই আপন মনে আপনার খেয়ালখুশিতে মেতে থাকবে। তার দিকে নজর দেবার অবকাশ থাকবে না তার।

হঠাৎ নোরা এক কাণ্ড করে বসল। বলিষ্ঠ কোন তরুণ যেমন সবল একটা গাছ সামনে দেখলে অকারণে একবার নাড়া দেবার চেষ্টা করে ঠিক তেমনি করে পাশে বসে থাকা তিরাইয়াকে দুহাতে চেপে ধরে নাড়া দিল নোরা। বলল, কি ভাবছ অত? লুসিয়াপাড়ার কোন বান্ধবীর কথা?

তিরাইয়া নোরার কথাই ভাবছিল। তার মনে হচ্ছিল, মেয়েটি একেবারে এদেশীয় বনে গেছে। মনের ভেতর শ্বেতাঙ্গ জাতির কোন উগ্রতা নেই। কেবল ভাষাতে নয়, আচরণেও তাকে যেন বিদেশী ভাবার উপায় নেই।

নোরার কথায় তার চিন্তার খেই কাটল। তিরাইয়া বলল, আমার আর কোন বান্ধবী নেই।

নোরা গম্ভীর গলায় বলল, মিথ্যে কথা, নুলিয়াপাড়ায় থাক আর না থাক আলবৎ তোমার বান্ধবী আছে।

বিশ্বাস কর নোরা, মিথ্যে আমি একটুও বলিনি।

নোরার গলায় ব্যথার সুর। বলল, এমন করে বলতে পারলে তুমি আমার পাশে বসে ?

তিরাইয়া এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সে নোরার হাতটা নিজের হাতের ভেতর তুলে নিয়ে বলল, ক্ষমা কর নোরা, আমি ভুল বলেছি। তোমার বন্ধুত্বের অমর্যাদা করেছি।

নোরা এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, সন্ধি হয়ে গেছে, এখন চল পাশা-পাশি হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাই।

ওরা এগিয়ে চলল। লোনা মাটির পথ চাঁদের আলোয় ধোয়া কাপড়ের মত সাদা দেখাচ্ছে। এখন পথের দুধারে কালচে সবুজ ধানের ক্ষেত।

নোরা এক একবার ধান ক্ষেতের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। ধানের লম্বা লম্বা পাতায় ঝলমল করছিল শিশির। ও হাত বুলিয়ে শিশির মেখে নিয়ে সেই হাত নিজের আর তিরাইয়ার গালে ছুঁইয়ে বলে উঠছিল, কি মিষ্টি কি মিষ্টি।

দুদিকে বহুদূর বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত। অনেক দূরে কুয়াশা আর আব-ছায়ায় প্রায় অবলুপ্ত গ্রাম-রেখা।

নোরা একসময় আঙুল তুলে দেখাল। বেশ কিছু দূরে দপ দপ করে এক টুকরো আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে।

তিরাইয়া বলল, ওটা একটা সরু খালের মুখ। সমুদ্রপুরের বাজার থেকে আজ কোন নৌকো সওদা করে এখানে এসে ঠেকেছে। জোয়ারে সহজেই উঠে এসেছে, এখন খর ভাঁটার টানে এগোতে পারছে না। নোঙর করে মাঝিরা রান্নাবান্নার জোগাড় করছে। তাই হয়ত আগুন দেখতে পাচ্ছ।

কিশোরীর মত চঞ্চল হয়ে উঠল নোরা—যাবে ওখানে ? বেশ ওদের ভেতর আজ কাটিয়ে দেব রাতটা।

তিরাইয়া হেসে বলল, খেয়ালের শেষ নেই তোমার। ধানের মাঠ পেরিয়ে যাবে কি করে ?

নোরা বাধা পেয়ে বলল, এ রাতটা ঝিলমহালে বক্রেশ্বরের ওখানে না গিয়ে পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে দিলে কেমন হয় তিরাইয়া ?

তিরাইয়া হেসে বলল, নিশি পাওয়ায় পেয়েছে তোমাকে। তাই পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর সাধ জেগেছে।

ওরা প্রায় আর্ধেক পথ আসার পর পথের ধারে একটা বাবলা গাছের তলায় ছোট্ট এক ঝোপাড় দেখতে পেল।

নোরা ছুটে গিয়ে ঝোপড়ির ভেতর উঁকি মেরে দেখল, কেউ কোথাও নেই। অমনি বলে উঠল, পথের ধারে এমন একখানা ঝোপড়ি কেন তিরা-ইয়া ?

তিরাইয়া ততক্ষণে ঝোপড়ির ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, পাশেই দেখছ সংকীর্ণ একটা খাল। এ খালেও জোয়ার-ভাঁটা খেলে যায়। তাই কোটালের দিনে গাঁয়ের লোকে এসব জায়গায় মাছ ধরতে আসে। তারা রাত জাগে। এ ধরনের সাময়িক ঝোপড়ি তুলে তার ভেতর বিশ্রাম করে।

নোরা বলল, আজ এখানে ওরা আসবে না ?

পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যার ভরা জোয়ার দেখে ওরা আসে। আজ এখানে এসে তাদের কোন লাভ হবে না।

নোরা হাতের সুটকেসখানা নিয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপড়ির ভেতর। বলল, আজ রাতে আমি আর এখান থেকে নড়ছিনে।

তিরাইয়া বলল, দারুণ খেয়াল তো তুমি !

নোরা ঝোপড়ির ভেতর থেকে বলল, চলে এস শিগ্‌গির ? দারুণ জায়গা একখানা।

তিরাইয়া ঝোপড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে মুখখানা নীচু করে বলল, তুমি তাহলে সত্যিই নড়ছ না আজ রাতে ?

ভেতর থেকে নোরা খপ্ করে ধরে ফেলল তিরাইয়ার একখানা হাত। বলল, আর কোন কথা নয় তিরাইয়া। মানুষের বসতির বাইরে এই রাতটুকু পথের ধারে উপভোগ করতে দাও।

নোরার হাতের টানে তিরাইয়াকে ঝোপড়িতে ঢুকতে হল।

তিরাইয়া বলল, অ্যাডভেঞ্চার খুব বেশী ভালবাস তুমি।

এখন আর কোন কথা নয়, এস আমরা হোল্ডলখানা খুলে এই খড়ের মেঝেতে পেতে ফেলি।

তাই হল। ওরা হোল্ডলটা খুলে মেঝেতে পেতে বসল।

নোরা বলল, প্রভুকে ধন্যবাদ যে বক্রেশ্বর চিঠি পেয়ে যথাসময়ে ঘোড়া নিয়ে হাজির হয়নি।

তিরাইয়া বলল, এই মুহূর্তে যদি দেখা যায় বক্রেশ্বর ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ?

নোরা তিরাইয়ার মুখে হাতখানা চাপা দিয়ে বলল, প্লিজ, আজ রাতের মত আমাকে আর বক্রেশ্বরের ভয় দেখিও না। দিনের বেলা বক্রেশ্বর কেন, তার বাবা এলেও আমি মোটেই অখুশী হব না। শুধু আজকের রাতটা ওদের দূরে থাকতে দাও। আমরা দুজনে গল্প করে কাটিয়ে দেব।

নির্জন নিস্তব্ধ রাতের অনেকগুলো প্রহর ওরা পার করে দিল। রুটিতে জেলি মাখিয়ে নোরা খেতে দিল তিরাইয়াকে, নিজেও খেল।

তিরাইয়া বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে। নোরা বলল, তোমার কোলে একটুখানি মাথা রেখে শুতে দেবে ?

আপত্তি করল না তিরাইয়া। বলল, বেশ তো শোও।

আবার বলল, তুমি না সারা রাত গল্প করে কাটাবে বলেছিলে ?

নোরা কোন কথা না বলে দেহটা হোল্ডলের ওপর প্রসারিত করে তিরাইয়ার কোলে বাদামী চুলে ভরা মাথাটা ডুবিয়ে শুয়ে পড়ল। তার মুখ দিয়ে আরামের একটা ধ্বনি শুধু বেরিয়ে এল।

তিরাইয়া বসে আছে স্থির হয়ে। নোরা ওর কোলে মুখখানা ডুবিয়ে শুয়েছিল, এবার একেবারে উল্টোদিকে তিরাইয়ার চোখাচোখি হয়ে শুল।

ঝোপড়ির ভেতর দু'একটা ছিদ্র পথে আলোর টুকরো এসে পড়ছিল। তাতে তিরাইয়ার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু নোরার উর্ধ্বমুখী মুখখানার ওপর সাদা ফুলের পাপড়ির মত ছড়িয়ে পড়েছিল দু'এক টুকরো আলো।

অবাক হয়ে তাই দেখছিল তিরাইয়া। হঠাৎ ফুলের গন্ধ নেবার মত করে সে মুখখানা নামিয়ে এনে কয়েকবার জোরে জোরে শ্বাস টানল। নোরার প্রসারিত মুখে কি যেন অজানা ফুলের সুন্দর একটা গন্ধ লেগে আছে।

নোরা বলল, কি দেখছ ?

তিরাইয়া বলল, দেখছি আর শুঁকছি।

খিলখিল আওয়াজ তুলে হেসে উঠল নোরা। বলল, কি দেখছ, আর কি শুঁকছ?

তোমার মুখের ওপর চাঁদের টুকরো টুকরো আলো ঠিক ফুলের পাপড়ির মত ছড়িয়ে পড়ে আছে, তাই তোমার মুখের গন্ধ নিচ্ছিলাম।

ওর গলাটা জড়িয়ে ধরল নোরা। বলল, তুমি আমার কবি তিরাইয়া।

তিরাইয়ার সারা দেহে একটা বিদ্যুৎ খেলা করে গেল। যৌবনের অশ্বটা দৌড়ের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু শক্ত হাতে রাশ টেনে ধরল তিরাইয়া। সে মনে মনে প্রভু যীশুর নাম করতে লাগল। ফাদারের প্রেয়ার হলে দাঁড়ান যীশুর মূর্তি সে চোখের সামনে দেখবার চেষ্টা করল। শয়তানের হাতে এই মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না। ফাদারের কাছে, প্রভু যীশুর কাছে, নিজের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে সে। বিশেষ করে ফাদারের কাছে সে অকৃতজ্ঞ হতে পারবে না। সামান্য লুসিয়ার শুধু প্রাণ-ধারণের ছোট্ট জগৎটুকু থেকে টেনে এনে যিনি অনেক বড় জগৎ আর তার চেয়েও বড় জীবনের সন্ধান দিয়েছেন তাঁকে প্রাণ থাকতে প্রতারণা করতে পারবে না তিরাইয়া।

ধীরে ধীরে চাঁদের আলো ম্লান হয়ে এল। নোরার মুখের ওপর ফুলের সাদা পাপড়িগুলো শুকিয়ে প্রথমে ম্লান, তারপর মুছে গেল।

এখন অস্পষ্ট নোরার মুখ। স্থির হয়ে চোখ বুজে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে নোরা। কি যেন সে চেয়েছিল তিরাইয়ার কাছে, তার ভাষাহীন আকুতিতে, কিন্তু কোন উত্তর সে পায়নি কোলো পাথরে গড়া ঐ মূর্তির কাছ থেকে। নারী কিছু পথ এগিয়ে এক জায়গায় থেমে দাঁড়ায়। এরপর সে প্রার্থনা করে, তার প্রার্থিত পুরুষ এসে তাকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ করে নিয়ে যাক। নারী চায়, তার আত্মসমর্পণ হোক শক্তিমান পুরুষের কাছে। সেখানেই সে তার যৌবন আর সম্মানকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে বলে মনে করে।

চমকে উঠল তিরাইয়া। তার পোশাক ভেদ করে জলের ছোঁয়া লাগল কেন?

সে অমনি হাত দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল নোরার মুখখানা।

জলে ভেজা মুখ নোরার। তিরাইয়ার হাতের ছোঁয়া পেয়ে নোরা মুহূর্তে মাথা নামাল তার কোলের থেকে।

তিরাইয়া অমনি বলল, কি হল মাথা নামালে যে? কষ্ট হচ্ছে?

নোরা ভাঙা গলায়, বলল, হচ্ছে। তোমার কোলে মাথা রাখতে, তোমাকে স্পর্শ করতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

তিরাইয়া বুঝল নোরা আহত হয়েছে। তার আত্মসম্মানে তীব্র আঘাত লেগেছে। একটি ফুটন্ত গোলাপ প্রার্থনা করে, কেউ তাকে স্পর্শ করুক, তার আকুল করা আঘ্রাণে বিবশ হোক। কিন্তু তার এ-চাওয়াটুকু ব্যর্থ হলেই সে মাটিতে ঝরে ঝরে পড়ে যায়। একটা রিক্ততার ব্যর্থ হাহাকার করতে থাকে।

তিরাইয়া অনেকক্ষণ অন্ধকারে নোরার চুলে হাত চালাতে লাগল।

একসময় মুখ নামিয়ে বলল, আমি তোমার যোগ্য নই নোরা। বিশ্বাস কর, আমি কোন দিক থেকেই তোমাকে পেতে পারি না। যা আমার নাগালের বাইরে, তাকে কোন এক অন্ধকারে হঠাৎ পেয়ে ভোরের আলোয় হারাতে চাই না। অক্ষম অযোগ্য বলে আজ তুমি আমাকে ঘৃণা করলেও দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর। আমিও মানুষ নোরা। আমার প্রত্যেকটা স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। তুমি শুধু আমাকে সাহায্য করতে পার, আমাকে অনুত্তেজিত রাখতে পার কেবল তুমিই নোরা।

নোরা উঠে বসে বলল, ভোরের কত বাকী তিরাইয়া?

বাইরের দিকে তাকিয়ে তিরাইয়া বলল, অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। ভোরের আর বেশী বাকী নেই।

একটু থেমে আবার বলল, তুমি রাগ করনি তো?

নোরা তিরাইয়ার মাথাটা আলতো করে ধরে নাড়া দিতে দিতে বলল, না, না, না, রাগ করব কেন? তোমাকে ভালবেসে দুঃখ পেয়েও আমার আনন্দ। এমন করে পৃথিবীতে কোন পুরুষ নির্জনে একটি তরুণীকে পেয়ে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারে তার উদাহরণ একমাত্র তুমি।

ঝিল মহালের সংলগ্ন মাঠে প্রতি বছর মেলা বসে। মেলার শেষে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। প্রথম দিন সকালে ঘোড়দৌড় আর দ্বিতীয় দিন নৌ-চালনা। এ সবের উদ্যোক্তা বক্রেশ্বর মণ্ডল। অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে নাম-টাকে গ্রামে-বিগ্রামে ছড়িয়ে দেবার প্রবল একটা ইচ্ছা জেগেছে তার মনে। এই ইচ্ছাকে সফল করার জন্য শুরু হয়েছে এই সব প্রতিযোগিতা। চার্চের অর্থেই এর আয়োজন। এসব নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে ফাদারের সমর্থন আছে ষোল আনা। যখন ক্ষমতা ছিল, অর্থাৎ চার-পাঁচ বছর আগেও ফাদার নিজেই উপস্থিত থাকতেন মেলাতে। নিজের হাতে পুরস্কার বিতরণ

করতেন সকল প্রতিযোগীদের।

এখন কাজটা বক্রেশ্বরই হাতে নিয়েছে। প্রতিযোগিতার শেষে অসংখ্য দর্শক জয়ধ্বনি দেবার সময়, বক্রেশ্বরের নামটা বাতাস ফাটিয়ে উচ্চারণ করে। বক্রেশ্বর হাত তুলে তাদের বারণ করার অভিনয় করে, কিন্তু মনে মনে দারুণ খুশী হয়ে ওঠে।

এবার ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় বক্রেশ্বর নিজে নেমেছে। পুরস্কারের তালিকা থেকে কিন্তু সে বাদ দিয়েছে নিজের নাম। সে যদি সফল হয় তাহলে তাকে বাদ দিয়ে পরবর্তী প্রতিযোগীই পাবে পুরস্কার।

অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এলিনোরার ওপর। সে প্রধান বিচারকও বটে।

প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে আর একজন, সে তিরাইয়া।

রাতে চার্চের কাছারীতে তাকে ডেকে বলেছে নোরা, ঘোড়া একটা বেছে নাও ঘোড়াশালা থেকে। কাল তোমাকেও কিন্তু প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। আমি তোমার নাম প্রতিযোগীদের লিস্টে তুলে নিয়েছি।

কিছু বলতে যাচ্ছিল তিরাইয়া কিন্তু নোরা অনুনয়ের ভঙ্গীতে তার দিকে তাকাতেই তিরাইয়া কোন কথা আর বলতে পারেনি।

একটু দূরে বসেছিল বক্রেশ্বর। সে মনে মনে ভাবল, এ আবার কোন আপদ এসে জুটল। সে প্রতিবারের এক নম্বর প্রতিযোগী মৈনুদ্দীনকে এবার টাকা খাইয়ে রেখেছে। তার ঘোড়ার আগে যেন মৈনুদ্দীন ঘোড়া না চালায়। দু'নম্বর হলেও প্রথম পুরস্কারটা তো মৈনুদ্দীনের বাঁধাই রইল। বক্রেশ্বর তো আগে ভাগেই নিজেকে বাদ দিয়েছে পুরস্কারের তালিকা থেকে। শুধু সে নোরার কাছে দেখাতে চায় তার পৌরুষ, তার কৃতিত্ব। সে যখন প্রথম হয়ে বেরিয়ে আসবে তখন নোরার চোখে-মুখে কি ছবি ফুটে ওঠে শুধু তাই দেখার জন্যে সে উন্মুখ।

আর সব প্রতিযোগীদের ভয় তার নেই। আসে বটে অনেকে, কিন্তু সব কটা ঘোড়াই তাদের জীর্ণ। অপুষ্টির চিহ্ন তাদের সারা দেহে ছড়িয়ে আছে। ঐ সব ঘোড়া তার তেজী বলিষ্ঠ ঘোড়াকে ডিঙিয়ে যাবে এ যে একেবারে ভাবনার বাইরে।

নোরার কথা শুনে আগেভাগে উঠে পড়ল বক্রেশ্বর। সে তিরাইয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, চল আমার সঙ্গে ঘোড়াশালা থেকে ঘোড়া বেছে নেবে।

তিরাইয়াকে নিয়ে বক্রেশ্বর এল ঘোড়াশালায়। তিন চারটে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে।

বক্রেশ্বর বলল, এই কালো মাণিকের ওপর লোভ করতে যেও না, ওটি আমার। বরং তুমি সবশেষের লাল ঐ ঘোড়াটা নাও। দেহখানা দেখে বুঝতে পারছ, জাত ঘোড়া ওটা!

বক্রেশ্বর মনে মনে হাসছে, কিছুদিন হল ঘোড়াটাকে বেতো বলে ও বাতিল করেছে। আর ওর পিঠে চেপে কোথাও যায় না। এককালে অবশ্য লোকে বলত, পাখা বাঁধা আছে ওর পিঠে। একেবারে পক্ষীরাজ। উড়ে চলতে পারে।

দেখতে বড, কিন্তু গুণাগুণ অজানা। নোরা কোন সন্দেহই করতে পারবে না তার মতলবের।

পরের দিন শুরু হল ঘোড়দৌড়। প্রতিযোগীরা মেলা প্রাঙ্গণ থেকে আবার ফিরে আসবে মেলা প্রাঙ্গণে। অতিক্রম করতে হবে মাত্র এই দশ মাইল পথ।

ছুটে গেল এক সারি ঘোড়া। চাবুকের পর চাবুক পড়ছে। বাতাসে সাঁই সাঁই বাজছে চাবুক। তিরাইয়ার বাহন লাল ঘোড়াটা চলেছে সবার পেছনে। তিরাইয়া তাকে চাবুক মারছে না। শুধু পায়ের চাপে তাকে জানাচ্ছে এগিয়ে চলার অনুরোধ।

জাত ঘোড়া পেছনে পড়ে থাকবে কি করে! ধীরে ধীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে তার সারা দেহে। কিছু পথ পেছনে চলার পর একটি একটি করে সে পনেরোটা ঘোড়ার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। রসুলপুর নদীর সীমা ছুঁয়ে সে যখন ঝিল মহালের মেলার দিকে মুখ ফেরাল তখন শুরু হল আসল খেলা। মৈনুদ্দীনের সাদা ঘোড়াটা বক্রেশ্বরের কালো ঘোড়ার সঙ্গে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে ছুটে চলেছে। বেইমানি করবে না মৈনুদ্দীন। সে মরে গেলেও বক্রেশ্বরের কালো ঘোড়াকে পার হয়ে যাবে না।

তিরাইয়ার লাল ঘোড়া ছুটছে। সামনে দুটো ঘোড়া এখনও তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ঝড়ের হাওয়া লাগল তার দেহে। ছুটছে না, যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে তিরাইয়ার ঘোড়া।

ঠিক যেখানে ঝিলমহালে আসার দিন ওরা ঝোপড়িতে রাত কাটিয়েছিল সেখানে মৈনুদ্দীনের সাদা ঘোড়াকে টপ্‌কে চলে গেল তিরাইয়ার ঘোড়া।

এ ঘটনা আশা করেনি মৈনুদ্দীন। সে এখন ক্রমাগত চাবুক মেরে চলল

তার ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু এখন লাল ঘোড়ার লক্ষ্য একটি মাত্র কালো ঘোড়ার ওপর। বেগ যেন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তার। কতদিন সে এমনি মনের উত্তেজনায় দৌড়বার সুযোগ পায়নি।

দূরে দেখা যাচ্ছে মেলা প্রাঙ্গণ। বিন্দু বিন্দু অসংখ্য মানুষের ভীড়।

লাল ঘোড়াটা যেন ক্ষেপে গেছে। সে ক্রমে কমিয়ে ফেলছে তার ব্যবধান। ঝিলমহালের সীমানায় এসে লাল আর কালো ঘোড়া ছুটছে পাশা-পাশি। ইঞ্চি ইঞ্চি করে বেরিয়ে যাচ্ছে লাল ঘোড়াটা।

রাগে দাঁতে দাঁত চেপে কালো ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়ে চলেছে বক্রেশ্বর। হঠাৎ একটা ভুল করে বসল সে। লাগাম ঘোরাল পেছন দিকে। শূন্যে দুটো পা তুলে চর্কির মত পেছনে ঘুরে দাঁড়াল ঘোড়াটা।

সাদা ঘোড়াটা ছুটে আসছে তার দিকে। বক্রেশ্বরের একটি মাত্র চিন্তা, হারাতে হবে ঐ নুলিয়ার বাচ্চাকে। মৈনুদ্দীনই এখন ভরসা। মান রাখলে ঐ পারবে রাখতে। মৈনুদ্দীন জিতলে সে হেরেও সুখী হবে।

বিদ্যুতের মত হাতের ইংগিতে মৈনুদ্দীনকে বুঝিয়ে দিল বক্রেশ্বর, তুমি এগিয়ে যাও।

পাশ দিয়ে সাদা ঘোড়াটা বেরিয়ে যাবার সময় হেঁকে বলল বক্রেশ্বর, ঝিলের ডানদিকে ঘুরে লাল ঘোড়াটা এগোচ্ছে, তুমি বাঁদিকে ঘুরে বড় রাস্তায় গিয়ে পড। অনেক তাডাতাড়ি যেতে পারবে।

নিয়ম ছিল, যে পথে ওরা এগিয়েছে কেবল সেই পথ ধরে ফিরতে পারবে। পথ বদলের প্রশ্নই নেই এখানে। কিন্তু কুচক্রী বক্রেশ্বরের কাছে আইন বলে কোন বস্তুই নেই। সে এখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। তিরাইয়াকে নোরার চোখে সে কোন রকমেই বিস্ময়ের বস্তু হতে দেবে না।

বাঁ দিকের একটা পথ ধরে ছুটেছে মৈনুদ্দীনের ঘোড়া। মূল পথটা ঝিলের ডান দিক বেষ্টন করে মেলা প্রাঙ্গণের দিকে চলে গেছে। ঝিলটা একটু বেশী রকম প্রসারিত ডানদিকে। তাই ঐ পথে ঘুরে আসতে সময় লাগে বেশী।

বাঁ দিকের চোরাপথ মানুষ জনের জন্যে। মাঠ থেকে জায়গায় জায়গায় জল উঠে এসে বর্ষাকালে পথ ভাসিয়ে দেয়। তখন এ পথে যাতায়াত করা খুবই অসুবিধে। এখন অবশ্য পথ শুকনো, তবে মূল পথের মত সমতল নয়। মাঝে মাঝে বালি, জায়গায় জায়গায় উঁচু।

বক্রেশ্বরের বাঁকা বুদ্ধিই কাল হল। মৈনুদ্দীনের ঘোড়া তীরবেগে ছুটে

এসে পড়ল নরম বালির ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে বসে গেল পা। ভারসাম্য হারিয়ে ঘোড়া সমেত আরোহী পড়ল উল্টে। বালি, তাই বেঁচে গেল মৈনুদ্দীন। অল্প চোটের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল ঘোড়াটা। ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে বক্রেশ্বর। সব আশা তার ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। এখন শুধু মুখ বাঁচানোর পালা।

সে মৈনুদ্দীনের চোট-লাগা হাতখানা নিজের পোশাক ছিঁড়ে জড়াল। তারপর মৈনুদ্দীনকে ভাগ্যাহত বীর সৈনিক এবং নিজেকে জগতের মহান সেবাব্রতী সাজিয়ে ফিরে গেল মেলা-প্রাঙ্গণে।

কাল মধ্যাহ্নে শুরু হবে নৌ-চালনা প্রতিযোগিতা। চার্চের দুটো নৌকো ছাড়াও সাবাড জেলেদের ক'খানা নৌকো যোগ দেবে প্রতি-যোগিতায়। ঝিলমহালের এলাকায় প্রতিযোগী মাল্লাদের রান্না, খাওয়া, গল্পগুজব চলেছে।

ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে তিরাইয়া, এখন নামতে হবে তাকে নৌ-প্রতিযোগিতায়। নোরা বলল, না করতে পারবে না। হারজিতটা বড় কথা নয়, তুমি তোমার ক্ষমতা প্রকাশ করেছ, এইটুকুই আমি দেখতে চাই।

তিরাইয়া বলল, তোমার ইচ্ছার দাম দিতেই শুধু আমি নামব কালকের প্রতিযোগিতায়।

রাতে কিন্তু গুপ্ত ঘরে গভীর একটা ষড়যন্ত্র চলছিল। ঝিলমহালের মাল্লাদের বক্রেশ্বর বলল, রাতেই চলে যাও নৌকোর ধারে। একেবারে তলায় ছোট্ট একটা কাঠের টুকরো এমন ভাবে আলগা করে রাখবে যাতে পায়ের জোর চাপ পড়লেই ফেঁসে যায়। কিন্তু এমনিতে যেন জল না ওঠে। সমুদ্রের ঐ নতুন চরটা ছুঁয়ে যখন নৌকোগুলো ফিরে আসতে থাকবে তখন তোমরা জোর দাঁড় টানার ভান করলেও জল কেটে দ্রুত এগোবে না।

যখন সঙ্গের নৌকোগুলো তোমাদের ছাড়িয়ে চলে আসবে তখন তোমরা দুজনে জোর পায়ের ধাক্কায় তলার কাঠটাকে সরিয়ে দেবে।

জল উঠতে থাকবে নৌকোয়। তিরাইয়া ঝুঁকে দেখতে যাবে, আর ঠিক তখনই তোমরা ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে সমুদ্রে। আমি নৌকো নিয়ে সারাপথ যেমন পাড়ি দিই তেমনি দেব। লক্ষ্য রাখব তোমাদের

দিকে। নৌকো ডুবে যাবার আগেই তোমাদের তুলে নেব। ভয় নেই।

পরের দিন বক্রেশ্বরের বারণ সত্ত্বেও নৌকোয় উঠল নোরা। অন্য সময় হলে বক্রেশ্বর খুশীতে বিগলিত হয়ে যেত, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে নারীসঙ্গ ঠিক নয়। তবু নিতে হল নোরাকে। একে বক্রেশ্বরের নৌকো চার্চের সম্পত্তি, তার ওপর এমন একখানা সুন্দর মুখের আবেদন। যা হয় হোক, নোরার চোখকে একটুখান আড়াল করতে পারলেই হল।

পাল তুলে তর্ তর্ এগিয়ে চলেছে নৌকোগুলো। হাল শক্ত হাতে ধরে ঢেউ কাটিয়ে, ঢেউ ভেঙে, ঢেউয়ের ওপরে চড়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে তার নৌকো তিরাইয়া। মাইল চারেক গেলেই পাওয়া যাবে সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা নতুন চরটা। ঐ চর বেষ্টন করে নৌকোগুলো আবার ফিরে আসবে।

নোরা লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করেও বারবার হারিয়ে ফেলছে তিরাইয়ার নৌকো। কখনও ঢেউয়ের তলায় কখনও ওপরে। অনেক নৌকো। পালগুলো প্রায় একই রঙের, গেরুয়ার আভা লাগা।

নোরার নৌকো চলেছে একটু দূর দিয়ে। ঐ তো চরটা। পাখির ঝাঁক উড়ছে চরের মাথায়। ওরা ভয় পেয়েছে এতগুলো নৌকোর হঠাৎ করে এসে পড়ায়।

নৌকোগুলো একরত্তি চরে পাক দিয়ে ঘুরে চলেছে।

এবার ফেরার পালা। এখন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিযোগীদের ভেতর। অনুকূল স্রোতে এসেছে, এখন যেতে হবে প্রতিকূল স্রোত ঠেলে ঠেলে অতি সাবধানে। এরই ভেতরে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতা তো রয়েছেই।

বক্রেশ্বর দেখছে। দূরবীনের মত চোখটাকে চরের আশপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। নোরার চোখ সামনের দিকে। ঢেউয়ের আঘাতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে নৌকোগুলো। সে খুঁজছে তার তিরাইয়াকে। অসম্ভব! ঢেউয়ের ওঠাপড়া আর নৌকোর এলোমেলো মিছিলের ভেতর থেকে তিরাইয়ার নৌকো বেছে নেওয়া অসম্ভব।

বক্রেশ্বর দেখল পরিকল্পনা মত পিছিয়ে পড়ছে তিরাইয়ার নৌকোটা। ঐ তো একবার যেন ঢেউয়ের মাথায় উঠল নৌকোটা। কাজ শুরু হয়ে গেছে। নিয়ম মাফিক কাজ করেছে দুটো মাল্লা। কাৎ হয়ে পড়েছে

নৌকোটা। পাক খাচ্ছে, ঝলক দিয়ে নির্ঘাৎ জল উঠছে নৌকোয়। ঠেলে অথৈ সমুদ্রে বাছাধনকে ফেলে দিয়েছে এতক্ষণে।

মনে মনে ক্রুর একটা হাসি হাসল বক্রেশ্বর। তিনটে নুলিয়াই যাক সমুদ্দুরের গর্ভে। নোরাকে নিয়ে ওদের দুটোকে উদ্ধার করতে গেলেই কেলেঙ্কারী বাধবে। হয়ত দেখা যাবে তিনটেই একসঙ্গে খাব খাচ্ছে। তখন ঐ শালা নুলিয়ার বাচ্চাটাকে ফেলে আসতে পারা যাবে না। ঐ ডাগর মেয়েটা তাহলে ডেকের ওপর ডান্স শুরু করে দেবে।

সবার আগেই তীরে এসে গেল বক্রেশ্বরের বহু দাঁড়ের নৌকো। দুটোতে যাত্রা শুরু করেছিল, এখন বেলা পাঁচটা। সূর্য ঢলে পড়েছে।

এক এক করে কূলে এসে ভিড়ছে নৌকোগুলো।

কোথায় তিরাইয়া। নোরার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠল। সব-ফিরে এলো। এলো না শুধু একখানা। সূর্য আকাশে রক্ত ঝরিয়ে ডুবে গেল। একটি আহত পাখির মত সন্ধ্যার আকাশে কান্না ছড়াতে লাগল নোরা।

বক্রেশ্বর সান্ত্বনার ছলে তাকে বুকের ওপর চেপে ধরে আশ্বাস দিতে লাগল, আজ রাতটুকু ধৈর্য ধরে থাক, কাল ভোরে সমুদ্র চুঁড়ে দেখব। হয়তো স্রোতের টানে নৌকোটা দূরে কোথাও ভেসে গিয়ে থাকবে।

বিহ্বল নোরা একটু যেন আশ্বস্ত হল। বক্রেশ্বর দ্বিতীয় সুযোগে নিজের হাতে মুছিয়ে দিল নোরার মুখে লেগে থাকা চোখের জল। নোরা কোন কথা বলল না। তার চোখের ওপর ভাসতে লাগল তিরাইয়ার মুখখানা।

পরের দিন ভোরবেলা। বক্রেশ্বরের নৌকো যাবে হারানো মানুষগুলোর সন্ধান করতে। সারা রাত ঘুম নেই নোরার চোখে। সে প্রভু যীশুর কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছে। মানুষগুলো ফিরে আসুক নিরাপদে।

কিন্তু বেলা বাড়তে লাগল, দেখা নেই বক্রেশ্বরের। গত রাতে কাছারী বাড়ি থেকে নিজের ডেরায় যাবার সময় অনেক সেধেছিল সে নোরাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য। ভান করেছিল, আহত নোরার সে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী। সারারাত সঙ্গে থেকে তার মনের ভার লাঘব করে দেবে। কিন্তু বক্রেশ্বরের ফাঁদে পা দেয়নি নোরা। কৈলাসপতি ক'দিন হল গেছে মফস্বল শহরে আদালতের কাজে। এ অবস্থায় নোরা বক্রেশ্বরের কাছে নিজেকে অরক্ষিত ভেবেছে। তাই কাছারীতে তিরাইয়া না থাকলেও বৃদ্ধ দারোয়ান, ঘোড়ার

সহিস আর ঠাকুর-চাকরের কাছে সে নিজেকে নিরাপদ সুরক্ষিত ভেবে কাটিয়ে দিয়েছে রাত। ভোরে কিন্তু সে উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছে বক্রেশ্বরের। বক্রেশ্বর না এলে নৌকো নিয়ে তল্লাসী চালাবে কে!

নোরার প্রতীক্ষা এখন অধীরতার রূপ নিয়েছে। বক্রেশ্বরের কাছে কাছারী থেকে লোক পাঠিয়েও কোন খবর মিলছে না। সে ক্রমাগত কাছারী থেকে নদী-তীরে যাচ্ছে আবার আসছে।

হঠাৎ এক সময় তার চোখে পড়ল একটা নৌকো আসছে সমুদ্রের দিক থেকে। সে পলকহীন তাকিয়ে রইল সেদিকে। উদ্বেগ আকুলতায় তার বুকখানা ওঠাপড়া করতে লাগল। সে যেন নিজের বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

ঐ তো তার তিরাইয়া! জনা পাঁচেক লোক রয়েছে নৌকোতে। সে আনন্দে চীৎকার করে উঠতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। দুহাতে নোরা ঢেকে ফেলল তার চোখ। এতখানি আনন্দের দৃশ্য দুটো চোখে সইবে সে কেমন করে!

নৌকো কূলে ভিড়তেই তিরাইয়া ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল নোরাকে।

নোরার কান্না থামতেই চায় না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলল সে তিরাইয়ার বুকের ভেতর মুখ রেখে।

তিরাইয়া এক সময় বলল, সময় নেই নোরা। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। যেমন আছ তেমনি এসে ওঠ নৌকোয়। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। আমরা এখন শয়তানের ডেরায় রয়েছি।

ওরা নৌকোতে উঠে পড়ল। মাঝি আর দাঁড়িতে আবার নৌকো ভাসিয়ে দিল পশ্চিম মুখে।

বিস্ময়ে হতবাক নোরা। কিছু পরে ঔৎসুক্য যখন তার সীমাহীন হল তখন সে কথা বলল, কোথায় ছিলে তিরাইয়া? সারা রাত আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে কটিয়েছি।

তিরাইয়া বলল, আমি জানতাম বক্রেশ্বর ধূর্ত, কিন্তু সে যে এতখানি শয়তান তা আমার ধারণার বাইরে ছিল নোরা।

নোরা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তিরাইয়ার চোখের দিকে।

তিরাইয়া বলল, জিজ্ঞেস কর ঐ মাল্লাকে, বক্রেশ্বরের বুদ্ধিতে ওরা আমার নৌকোতে উঠেছিল। ওরা আগে থেকেই দুর্বল করে রেখেছিল নৌকোর তলাটা। তারপর ফেরার পথে নিজেরাই পায়ের ধাক্কায় ফুটো করে দিয়েছিল নৌকোটা। ঐ ফুটো পথে জল উঠে নৌকা গেল ডুবে।

নোরা বলল, কিন্তু ওরা কি জানত না নৌকোটা ফুটো হলে ওদেরও সর্বনাশ!

তিরাইয়া বলল, এই সরল মানুষগুলোকে বক্রেশ্বর বুঝিয়েছিল, নৌকা ডুবলে সে তার নৌকো নিয়ে গিয়ে কেবল ওদেরই উদ্ধার করবে।

তারপর!

তিরাইয়া বলল, ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু নৌকো ডুবলে ওরা দেখল, কেউ ওদের উদ্ধার করতে এগিয়ে এল না। ওরা হাবুডুবু খাচ্ছে. লড়াই করছে ঢেউয়ের সঙ্গে। চোখের সামনে একজন অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি লগির বাঁশটাকে ধরে একটু ভেসে থাকার চেষ্টা করছিলাম তখন। যে তখনও সামনে ছিল তার দিকে বাঁশের একটা প্রান্ত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, ধর এটা। ও সেটাকে ধরল।

ভাগ্যিস আমরা চরটা ছাড়িয়ে বেশীদূর আসিনি। ঢেউও ছিল আমাদের অনুকূলে। আমরা গা ভাসিয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই না করে এক সময় উঠলাম চরে।

এলে কি করে?

প্রভুর কৃপায়। যারা আমার নৌকোতে ছিল তারা যখন ঘরে ফিরল না তখন তাদের মাল্লাপাড়ার এই নৌকোখানা ভোরে ভোরে রওনা হয়ে গেল চরের দিকে। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে ওরা ফিরছে।

নোরা বলল, এখন আমরা কোথায় চলেছি?

গীর্জার দিকে।

ওরা তো আজ ফিরতে পারবে না, তাহলে ওদের বাড়িতে খবর পাবে কি করে?

তিরাইয়া বলল, ওদের একজন নেমে চলে গেছে। তার কাছেই খবরটা পাবে।

নোরা তিরাইয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, প্রভু তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অশেষ দয়াময় প্রভু আমার।

ঘটনার সমাপ্তি সহজেই ঘটে গেল। ফাদার সবকিছু শুনে অবিলম্বে বিজ্ঞাপন দিয়ে ঝিলমহাল বেচে দিলেন। তিনি বললেন, দুর্জনের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়াটা কোন কাজের কথা নয়। তাছাড়া আমরা মিশনারী। মানুষকে সংশোধন করা আমাদের কাজ, শাস্তি দেওয়া নয়।

কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই মিটল না। যে মানুষখেকো বাঘ একবার মানুষের গন্ধ পায় সে আঘাত না হেনে সহজে সরে যায় না। তাই বক্রেশ্বরকে নতুন চেহারায় দেখা গেল।

হাওয়ায় উড়ে এল খবর। সে খবর রটে গেল নুলিয়া পাড়ায়। নদীর ওপার থেকে পাড়োয়া নৌকা নিয়ে সাবাড জেলেরা আসবে গীর্জার সামনের সমুদ্রে মাছ ধরতে। বাধা দিতে গেলেই এপারের নুলিয়াদের রক্তে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে সমুদ্র।

চিরদিনের অলিখিত একটা নিয়ম আছে। সাবাড জেলেরা যায় দূর দরিয়ায় মাছ ধরতে। তেলেগু নুলিয়ারা দু'এক মাইল সমুদ্র-সীমার ভেতরেই তাদের মাছ ধরার কাজ চালায়। কিন্তু এ যে নিয়মের ব্যতিক্রম।

তিরাইয়া বোঝে, কে ঐসব সাবাড জেলেদের উত্তেজিত করছে। কার শয়তানী মাথাটা কাজ করছে এই অশুভ পরিকল্পনার পেছনে।

তিরাইয়া ছেড়ে দেবে না ওদের সহজে। সে ও শেষ লড়াই করে দেখবে শয়তানকে প্রভুর পবিত্র-সীমা থেকে সরিয়ে দিতে পারে কিনা।

বাধা এল ফাদারের কাছ থেকে। তিনি তিরাইয়াকে ডেকে বললেন, আমরা মিশনারী। আমি মনে করি তুমিও মিশনারী। খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করাই আমাদের কাজ, যুদ্ধ করা আমাদের কাজ নয়।

তিরাইয়া বলল, অপরাধ নেবেন না ফাদার, আমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি।

ফাদার খানিকটা উত্তেজিত হয়েছেন বলে মনে হল। তিনি বললেন, প্রতিবাদের ইচ্ছে থাকলে করুক নুলিয়ারা, তুমি, ধর্ম প্রচারক হয়ে কেন নিজেকে, সঙ্গে সঙ্গে এই চার্চকেও ওদের সঙ্গে জড়াচ্ছ?

তিরাইয়া বলল, জন্মসূত্রে ঐ অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরিদ্র নুলিয়াদের সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ আছে। তাই ওদের বিপদে আমি দূরে সরে থাকতে পারি না।

একটু থেমে বলল, আপনি আমাকে আলোর পথ দেখিয়েছেন, সেজন্য আপনার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। আমি নিজেকে বিপদের সঙ্গে জড়িয়ে চার্চকে জড়াতে চাই না। আপনি আমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দিন, আমি গীর্জা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনার শেষ দিনগুলিতে আপনার কাছে থেকে সেবা করার সুযোগ পাব না বলে গভীর দুঃখ পাব, কিন্তু আপনাকে অসম্মানের ভেতর টেনে আনিনি ভেবে শান্তি পাব আরও বেশী।

ফাদার তিরাইয়ার দিকে চেয়ে বললেন, ইচ্ছে করলেই কি ত্যাগ করা যায় তিরাইয়া? তোমার সঙ্গে আমার কিংবা এ চার্চের যোগ প্রভুই ঘটিয়েছেন, ছিন্ন করার মালিক তাই তিনি। প্রভুর রাজ্যে যোগ আছে, বিয়োগ নেই। তুমি ছেড়ে চলে গেলেও তোমাকে ত্যাগ করার অধিকার আমার নেই।

তিরাইয়া মাথা নীচু করে বলল, অপরাধ নেবেন না ফাদার, আমার মায়ের স্মৃতিমাখা আর প্রভুর করুণার স্পর্শমাখা এই চার্চ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

কদিন হল নুলিয়া বস্তি থম থম করছে। কিসের যেন একটা প্রতীক্ষা করে আছে সবাই। মেয়েদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে আতঙ্ক। কচিকাঁচা ছেলেগুলো অবধি সমুদ্রের কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। জোয়ান নুলিয়ারা কাছে-পিঠে মাছ ধরে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসে। টাউনের হাটে মেয়েরা মাছ নিয়ে যায়, কিন্তু যে কোন দামে ছেড়ে দিয়ে চুবড়ি মাথায় হনহনিয়ে ফিরে আসে সকাল সকাল।

দুপুরে সারা নুলিয়া পাড়া ভেঙে আসে চার্চের দাওয়াইখানার সামনে। মেয়েমদ্দ বুড়ো-বাচ্চা কেউ বাদ যায় না। পরামর্শ হয়। তিরাইয়াকে কেন্দ্র করে জোট বাঁধে সবাই। তিরাইয়া খ্রীষ্টান কিন্তু প্রতিটি নুলিয়া জানে তিরাইয়া তাদের আপনার লোকের চেয়েও অনেক কাছের মানুষ।

তিরাইয়ার পরামর্শে চলছে সবাই।

নোরা এক রাতে তিরাইয়াকে পাকড়াও করে নিয়ে এল ওর শোবার ঘরে। হাত ধরে ওর বিছানায় বসিয়ে বলল তুমি কেন এই গোলমালের ভেতর যাচ্ছ তিরাইয়া? পরামর্শ দিচ্ছ দাও, কিন্তু কুনির মুখে শুনলাম, তুমি নাকি দাঙ্গাটা লীড করছ?

তিরাইয়া বলল, খবরটা ইতিমধ্যেই পাওয়া হয়ে গেছে?

নোরা গভীর উদ্বেগে বলল, হাসি নয় তিরাইয়া, খবরটা শোনার পর থেকে আমি ঘুমুতে পারছি না রাতে।

হঠাৎ নোরা নতজানু হয়ে বসে তিরাইয়ার দুটো হাত ধরে বলল, আমার মুখ চেয়ে কি তুমি তোমার পরিকল্পনাটা পাল্টাতে পার না তিরাইয়া?

তিরাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করে বসে কি ভাবল। তারপর এক সময় মুখ তুলে বলল, তুমি আমাকে ভালবাস নোরা?

নোরা যে উদ্বেগ বুকের মধ্যে চেপে রেখেছিল তা হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত কান্নায় আছড়ে পড়ল। সে তিরাইয়ার হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

তিরাইয়া ওর মুখখানা দু'হাতে তুলে ধরে বলল, আমার রক্তে সমুদ্রের ডাক রয়েছে। আমি নুলিয়া নোরা। ভদ্র সমাজের কেউ আমাদের ভালবাসতে পারে না।

তুমি আজ যে কথা বলছ, কাল স্থির হয়ে বসে যখন ভাববে তখন নিজের কথাই তোমাকে লজ্জা দেবে। কদিন আমরা একই সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, তাই তোমার মনের ভেতর হয়ত একটা মানুষের দাগ পড়ে থাকবে। কিন্তু ও দাগ চিরস্থায়ী হতে পারে না নোরা, ও একদিন নিঃশেষে মুছে যাবে।

নোরা উঠে দাঁড়াল। তার গলায় আর কান্না নেই। বলল, সব সইতে পারব শুধু পারব না আমার ভালবাসার অমর্যাদা সইতে। সে যা হোক, যদি কোনদিন প্রভু সুযোগ দেন তাহলে তোমার মত নুলিয়ার ঘরের ছেলের নৌকোতেই আমি সমুদ্রে ভাসব।

একটু থেমে বলল, আমি বড় জেদী তিরাইয়া।

তিরাইয়া বলল, বিশ্বাস কর নোরা, আমি রাত পোহালে তোমার কাছ থেকে যাত্রা পথের শুভেচ্ছা চেয়ে নেব ভেবেছিলাম। তুমি তার থেকে কি আমাকে বঞ্চিত করবে?

নোরা বলল, তোমাকে ভালবাসি বলেই, কান্না দিয়ে আর তোমার পথ ভাসাব না। তোমার জয় হোক্, এই প্রার্থনাই করব প্রভুর কাছে।

এক সঙ্গে পাশাপাশি সারি দিয়ে আসছে প্রায় পঞ্চাশখানা পাডোয়া নৌকো। দূর থেকে পঞ্চাশখানা পাল যেন রণক্ষেত্রের পঞ্চাশখানা শিবির বলে মনে হচ্ছে।

এপারের নুলিয়া পাড়ায় আজ মৃত্যুর স্তব্ধতা। সকালে যথা নিয়মে গীর্জার ঘন্টা বেজে গেছে। কিন্তু সমুদ্র তীরে দেখা যায়নি নুলিয়াদের। জলযাত্রায় বেরোয়নি নৌকো।

তিরাইয়া যথা নিয়মে গীর্জার ঘন্টা বাজিয়ে সেই যে চার্চ থেকে বেরিয়ে গেছে তার আর দেখা নেই। শুধু যাবার সময় তার সঙ্গে নোরার এক ঝলক দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল। নোরা দাঁড়িয়েছিল তার শোবার ঘরের দরজা খুলে। হাতে ধরা ছিল প্রভু যীশুর একখানা ছবি।

তারপর দুজনে শুনতে পেয়েছিল সিঁড়িতে কাদারের উঠে আসার শব্দ। মুহূর্তে ঘরের দরজা বন্ধ করে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল নোরা। সে দেখছিল, তিরাইয়া বালিয়াড়ি ভেঙে বনঝাউএর পাশ কাটিয়ে কুনির ঝোপড়ির দিকে চলেছে। সম্ভবত: অর্জুনার খোঁজে চলেছিল তিরাইয়া। আজকাল বিয়ের পর কুনির ঝোপাড়তেই রাত কাটায় অর্জুনা।

তিরাইয়া অদৃশ্য হয়ে যেতেই চোখ বন্ধ করে বুকের ওপর যীশুর ছবিখানা চেপে ধরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নোরা।

সূর্যের আলো রূপোর গয়না-পরা নর্তকীর মত নীল সমুদ্রের আসরে ঝলক দিয়ে নেচে চলেছে। দূরাগত কামানের গর্জনের মত গুম্ গুম্ গড়াম্ শব্দ তুলে তীরে আছড়ে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ।

পাড়োয়া নৌকোগুলো মুলিয়া বস্তির কিছু দূরে এসে জড়ো হল। এ পক্ষের কোন রণসজ্জা নেই দেখে তারা কিছুটা অবাক হল নিশ্চয়। কিন্তু এসেছে যখন এতখানি সমুদ্র চষে তখন অধিকারটা পাকা করে যেতে হবে। ওরা সামনের সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে মাছ তুলতে লাগল।

সারাদিন মাছ তোলার কাজ চলল ওদের। আর নয়, এবার ঘরে ফেরা।

সূর্যের সোনায় এখন লালের ছোঁয়া। অনুকূল হাওয়া লেগেছে পালে। সমুদ্রের রঙে আকাশের আবীর ছড়িয়ে পড়ছে।

কুনির ঘরের দিক থেকে একটা হাউই উঠল আকাশে। তখনও অন্ধকার নামেনি, তাই হাউইয়ের আলো চোখে পড়ল না বিপক্ষের।

সারি সারি টেপ্পা কোথা থেকে তেজী ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল ঢেউয়ের চূড়োয়। আশ্চর্য ক্ষিপ্র একদল অশ্বারোহীর মত তারা তাড়া করল বৃহদাকার পাড়োয়া নৌকোগুলো। একেবারে কাছে গিয়ে এক একখানা পাড়োয়াকে ঘিরে ফেলেছে দু'তিনখানা করে টেপ্পা। মশালে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে ওরা পাড়োয়ার পাল লক্ষ্য করে। এদিকে কুড়ুল আর শাবলের ঘায়ে চিড় ধরিয়ে দিচ্ছে নৌকার গায়ে।

প্রায় আধঘন্টার ভেতর বিভ্রান্ত নৌকোগুলোর সব কটাতেই অল্পবিস্তর আগুন ধরে গেল। প্রাণপণ দাঁড় টেনে যে নৌকোগুলো পালাবার চেষ্টা করেছিল সেগুলোই পড়ল বিপদের আবর্তে। সন্ধ্যার তীব্র বায়ুপ্রবাহ আর দাঁড়ের বেগ একসঙ্গে মিলে নৌকোগুলোতে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে দিলে।

জ্বলছে নৌকোগুলো। জ্বলতে জ্বলতে পাক খাচ্ছে। কোনটাতে ঝলকে

বলকে জল উঠে আসছে ছিদ্রমুখে। ঢেউয়ের ধাক্কায় ছিদ্রমুখ বৃহৎ হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে নৌকো।

সারা নৌবহরে একটা মৃত্যুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। চীৎকার উঠেছে, ভাল করে শোনা যাচ্ছে না ঢেউয়ের গর্জনে। একসঙ্গে দল বেঁধে আক্রমণের কোন সুযোগই পাচ্ছে না ওরা। পাড়োয়া নৌকোর ওপর থেকে বড় বড় লগি আর লাঠি চালাবার চেষ্টা করছে মাঝিমাল্লারা। সে-সব লাঠি অনেক নীচের থেকে টান দিয়ে কেড়ে নিচ্ছে টেপ্‌পার আরোহীরা। মার খাচ্ছে, দ্রুত সরে যাচ্ছে দূরে, আবার এগিয়ে আসছে। ওদের নেই জলডুবির ভয়।

অমাবস্যার নিবিড় রাত ঘনিয়ে উঠল। দগ্ধ শিবিরের শেষ স্ফুলিঙ্গগুলো রাত্রির আকাশে খসে পড়া নক্ষত্রের মত আলো ছড়িয়ে নিভে নিভে আসতে লাগল।

কদিন পরে লাল পাগড়ী সেপাই আর পুলিসে ছেয়ে গেল সমুদ্রতীর। মারধোর, অ্যারেস্ট চলল। শোনা গেল বহু বিত্তের মালিক পাড়োয়া নৌকোর মহাজনরা প্রচুর টাকা ছড়িয়েছে। নুলিয়াদের জয়ের পুরস্কার এল হাজত-বাসের ভেতর দিয়ে।

তিরাইয়ার হাত আগুনে জখম হয়েছিল। প্রতিদিনের সেবায় তাকে সারিয়ে তুলছিল নোরা। কিন্তু চার্চের লোক হয়েও পার পেল না সে। দলের লীডারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল আদালতে।

মুচলেকা দিয়ে, কিছু অর্থ খসিয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করে নিল প্রায় সবাই। কিন্তু বাধল তিরাইয়ার আত্মসম্মানে। সে কিছুতেই নিজের বিবেককে বলি দিয়ে মাথা নোয়াতে পারল না।

নোরা পথের দিকে চেয়ে থাকে। দেখে একে একে সবাই ফিরে আসছে ঘরে, এলো না শুধু একজন, সে তার তিরাইয়া।

কুনি তাকে খবর দিয়ে যায় একদিন, তিরাইয়া দাদার দশ বছর ফাটকবাস হয়েছে।

মেয়েটা কথা বলতে বলতে নোরার কাছে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

কাঁদতে কাঁদতেই বলল, রায় বেরুবার দিন অর্জুনা গিয়েছিল কাছারীতে। তাকে ধরে তিরাইয়া দাদা বলে দিয়েছে, ফিরে এসে যদি শুনি কুনিকে কষ্ট দিয়েছিস তাহলে তোকে আর আস্ত রাখব না।

নোরা কুনির মাথাটা বুকে ঠেকিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। তার চোখ

বেয়ে তখন টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

দশটা বছর কালের যাত্রায় নিশ্চয় দীর্ঘ নয়, তবু কি অসামান্য ক্ষমতা তার পরিবর্তন ঘটাবার।

পাড়োয়া নৌকো নিয়ে এখন নদীর ওপারের নুলিয়ারা সমানে চার্চের সামনের সমুদ্র চষে বেড়ায়। বাধা দেবার নেই কেউ। যে একাই হাজারটা ফণা তুলত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে এখন জেলে পচে মরছে।

নুলিয়ারা একে একে চলে গেছে নুলিয়াপাড়া ছেড়ে। তারা আর এ মুল্লুকে থাকবে না। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। খড়কুটো উড়ছে সমুদ্রের হাওয়ায়। রান্নার পোড়া কাঠগুলো চিতার আধপোড়া ছড়ান কাঠের টুকরো বলে মনে হচ্ছে।

কুনি যেতে চায়নি, সে কেঁদে-কেটে অস্থির করে তুলেছিল, কিন্তু অর্জুনা তাকে জোর করে নিয়ে গেছে। তিরাইয়ার কথা রেখেছে অর্জুনা। সে কুনির অক্ষম বাবাকে একা এই মহা শ্মশানে ফেলে রেখে যায়নি। সঙ্গে নিয়ে গেছে।

এদিকে চার্চের ছোট্ট সংসারে ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। নতুন এক মিশনারী এসেছেন চার্চে। নোরাকে সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেছেন তিনি।

ফাদার আরেভিনো গত হয়েছেন বছরখানেক হল। তিনি বড়দিনের উৎসবে কলকাতায় গিয়ে পরিচিত হন তরুণ মিশনকর্মী ভট্টচারিয়ার সঙ্গে। এদেশীয় কিন্তু প্রভুর ধর্মপ্রচারে বড় নিষ্ঠাবান। তাই দেখে ফাদার আরেভিনো মুগ্ধ হন। পরিচয় করিয়ে দেন নোরার সঙ্গে। আলাপের সূত্র ধরে ভট্চারিয়া চলে আসেন নির্জন সমুদ্র-তীরের চার্চে।

স্মৃতি ধূসর হয়ে আসে। একটি কষ্টিপাথরের নিটোল দেহ অন্ধকারের আবছায়ায় মিলিয়ে যায়।

শুধু যখন তার জীবনের নতুন অতিথি ভট্চারিয়ার দুটি হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে থাকে নোরা তখন হঠাৎ তার সামনে থেকে সবকিছু সরে যায়। সে ভাবে চোখ তুললেই দেখতে পাবে সে তিরাইয়ার মুখ।

আবার ওরা যখন সমুদ্রে স্নান করতে নামে তখন ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে ভট্চারিয়া তাকে ছুঁয়ে দিলে মনে হয়, তিরাইয়া তাকে স্পর্শ করছে। অমনি সারা দেহ জুড়ে খেলতে থাকে রোমাঞ্চের শিহরণ।

কিছুদিন নির্জন সমুদ্র তীরে কাটানোর পর ভট্চারিয়া ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কলকাতা মহানগরীতে জন্ম, কাজ করেছেন ওখানে, শুধু নোরার

টানেই তাঁর আসা এই জনমানবহীন সমুদ্রতীরে।

প্রথম প্রথম ভট্টচারিয়া বোঝালেন নোরাকে। কলকাতা গিয়ে তাঁরা দুটিতে যে প্রভুর কাজ অনেক ভালভাবে করতে পারবেন সে কথা প্ল্যান-প্রোগ্রাম সহ বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু ফাদার আরেতিনোর স্বপ্নসৌধ এই গীর্জা ছেড়ে কিছুতেই নড়তে চাইল না নোরা।

প্রথমে মান-অভিমান, তারপর শুরু হল বিবাদ-কলহ। একদিন ভটচারিয়া যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই ফিরে গেলেন কলকাতা। নোরাকে যাবার সময় শুধু বলে গেলেন, কলকাতায় আমার ঘরের দরজা সব সময়েই খোলা থাকবে তোমার জন্যে, এ মৃত্যুপুরীর মোহ যখন কাটবে তখন চলে এস ওখানে, মনে কোন দ্বিধা না রেখে।

টাউনে নেমেই সব খবর সংগ্রহ করল তিরাইয়া। ফাদারের মৃত্যু, নোরার নতুন জীবন, গুলিয়াদের দেশত্যাগ।

বুকখানা যেন তার কোন অসতর্ক মুহূর্তে একটা বড় ঢেউ এসে ভেঙে দিয়ে গেল।

তিরাইয়া বিচলিত হল, কিন্তু থামল না। সে প্রাণপণ শক্তিতে পা দুটো টানতে টানতে সন্ধ্যার আবছায়ায় এসে স্পর্শ করল তার জন্মস্থানের মাটি।

ধূ ধূ করছে জনহীন প্রান্তর বালি উড়ছে সন্ধ্যার বাতাসে। দূরে অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে গীর্জা।

তিরাইয়া পায়ে পায়ে চলে এল ঝাউবনের ভেতর। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়ার ঝাপটায় ঝাউবনটা হা হা করে কেঁদে উঠল।

তিরাইয়া হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগল তার ফেলে যাওয়া টেপ্পাখানা।

হাতে ঠাওর পেল সে। উড়োবালিতে নৌকোটাকে কবর দিয়ে দিয়েছিলি।

তিরাইয়া নৌকোটাকে টেনে তুলল। শিমুল কাঠের হালকা নৌকো। নৌকোর বুকেই পাওয়া গেল বৈঠা। সামান্য ঠিকঠাক করে সে নৌকোটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলল জলের দিকে। চাঁদ উঠেছে। অন্ধকার কেটে আলোর খবর ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

টেপ্পাকে দু'হাতে জলে ঠেলে দিয়ে তার ওপর উঠে পড়ল তিরাইয়া।

কল কল করে কথা বেজে উঠল তার ছোট্ট নৌকোখানা ঘিরে।

তিরাইয়া কান পেতে শুনতে লাগল তার মায়ের আদর ঝরানো গান।

ঝাউবনের আড়াল থেকে চাঁদটা বেরিয়ে এসেছে আকাশে। বালিয়াড়ি, সমুদ্রে জ্যোৎস্নার মায়া উত্তরীয়খানা কেঁপে কেঁপে উড়ছে। চার্চের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে নোরা চেয়েছিল সমুদ্রের দিকে। গীর্জার সামনের ঝাউ গাছের পাতায় বাজছিল করুণ কান্নার সুর।

হঠাৎ নোরা দু'হাতে চোখ মুছে আবার তাকাল।

যেখানে চাঁদের আলো সমুদ্রের বুকে রূপো ছড়াচ্ছে ঠিক তারই ভেতর একখানা নৌকো ভাসছে। আরোহী সিলুয়েট ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে তার ওপর।

তিরাইয়া, তিরাইয়া—চীৎকার করতে করতে গীর্জার ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল নোরা। গীর্জার গম্বুজে সে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

নোরা ছুটে চলেছে। বনঝাউয়ের প্রান্তর পেরিয়ে বালিয়াড়ি ভেঙে সমুদ্রের দিকে। তিরাইয়া, তিরাইয়া, তিরাইয়া— ।

কাঁপা কাঁপা ডাকটা ছুটে চলল, ঝাউবন, বালির প্রান্তর পেরিয়ে চাঁদের আলো ঝরা সমুদ্রের দিকে।

॥ শেষ ॥